হাওয়াবদল ও অন্যান্য রচনা

হাওয়াবদল ও অন্যান্য রচনা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও অনাথনাথ দাস সংকলিত

প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৬০

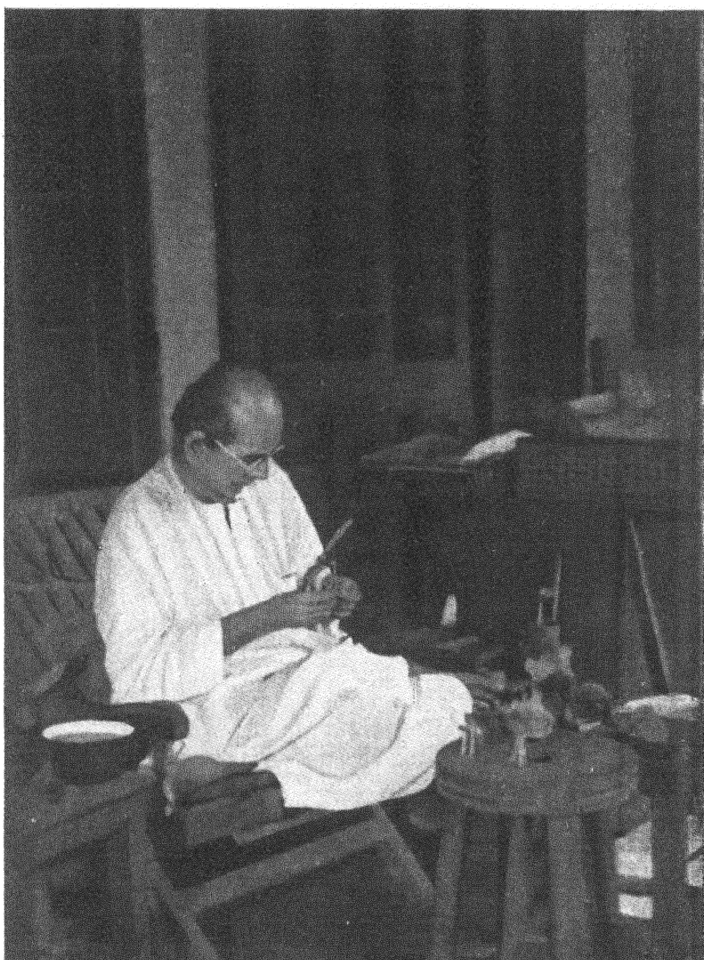
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৮·০০

সূচীপত্র



হাওয়া-বদল : শব্দচিত্র



কুটুম্ কাটুম্-স্রষ্টা
শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

আমার সকালেও ঘুম ভাঙে না দেখে আমি নিজে থেকে একটা প্রহরী ঘড়ি (Alarm Clock) কিনে মাথার শিয়রে রেখেছিলেম, ঘড়ি রোজই ঠিক সূর্যোদয়ে চেঁচিয়ে ঘুম ভাঙায়, ঠিক যেভাবে নেতা ঘুম ভাঙাতে চলে ঘুমন্ত জাতির! তেমন করে জেগে দেখি সকাল ভালো লাগে না, কাজ ভালো লাগে না, মাথা ধরে। জাগার পরে, ঘুম যেন আরো বেশি করে জড়িয়ে আসে দেহে মনে! এমনি ভাবে জেগে আমার কোনো ফল হল না, শরীর মন দুইই খারাপ হয়ে উঠল দেখে প্রহরী ঘড়িকে ঘরে পাহারা দিতে রেখে আমি পাহাড়ে গিয়ে বাসা নিলেম। সেখানে জাগরণ একটি অজানা পাখির ডাকে মধুর হয়ে এল রাত্রি-শেষে, তেমন করে জেগে আনন্দে ভরল প্রাণ, স্ফূর্তি পেল দেহ, ফিরে পেলেম অনেক দিনের হারানো স্বচ্ছন্দতা।

শিয়ালদহ

ই. বি. এস. আর বড়ো ইংরিজি অক্ষরে লেখা—সাদায় কালোয়, এলা-মাটি আর চক্‌লেট রঙ-দেওয়া দেয়ালে, খোঁচা খোঁচা কাঠের বেড়া তারি মাঝখানটাতে নুড়ি আর পাথুরে কয়লার সরু পথ দুটো সরু ইস্পাতের টানা-বাঁধনে-বাঁধা। এরি মাঝে দাঁড়িয়ে একটা ইঞ্জিন হঠাৎ সিটি দিয়ে দূরের আকাশকে মাঠকে টিনের ছাতগুলোকে ডাক দিলে। সারি সারি গাড়িগুলো চম্‌কে উঠে যেন দেখতে চলল ব্যাপার কি—সহরতলির দিকে।

E. B. S. R.

করকরে টিনের মস্ত মস্ত তালি-দেওয়া পাহাড়-প্রমাণ ঢালু ছাত, শুক্‌নো পেঁয়াজের খোলার মতো রুখো আকাশ থেকে হিম আর বৃষ্টি ঝ'রে ঝ'রে টিনের গায়ে লংকা বাটার ঝাল রঙ ধরিয়েছে। সেই ছাদের তলায় সারি সারি ঢাকা-দেওয়া ঘর পরদেশে নিয়ে চলে পাত্রের পুত্র সদাগর পুত্র কোটালের পুত্র কত পিতামাতা পুত্রকলত্র পোঁটলা পুঁটলি লোকলস্কর মালপত্র। গরুর গাড়িগুলো সারি সারি পথের

ধারে দাঁড়িয়ে ঘাড় তুলে চেয়ে থাকে অবাক হয়ে, সুয়োরানীর পুত্র শুধু গুম্ হয়ে বসে মায়ের গলার সোনার হারখানা [দেখে] আর দুয়োরানীর পুত্র জালনা দিয়ে একটি রোগা হাত বাড়িয়ে তাকে বলে, পয়সা পয়সা পান বিড়ি সিগারেট!

সহরতলি

সাবানের কারখানা, সুরকি মিল, তেল কল, সোজা সোজা চিম্নি— এর মাঝে দাঁড়িয়ে, ডাইনে হেলে বাঁয়ে হেলে, ক'টা নারকেল গাছ— কোনো একটার আড়াইখানার বেশি পাতা নেই, তাও আবার আধ-শুকনো! কতকালের বে-মেরামৎ কে জানে কার বাগানবাড়ি। সে-কালের বাড়িতে একালের টালি-ছাতের তালি-দেওয়া গেরোস্তো বাড়ি, মস্ত লম্বা দীঘি—খানিকটা ভর্তি আস্তাকুড়ের আবর্জনায়, খানিকটাতে পড়েছে সবুজ পানা, তারি একটু ফাঁকে থিতোনো জলে পড়েছে পেঁয়াজের খোলার মতো অপরিষ্কার লাল আলোর টান্-টোন্ বিকেল বেলায়!

পদ্মা

লোহার ঝাঝরের ঝন্নৎকার, তারি তলায় পদ্মার নিথর জল রাত্রির সমান নীল স্তব্ধ। কূল নেই কিনারা নেই, ঘাট আঘাট আরম্ভ শেষ কিছু পাইনে, শুধু পাই দেখা দূর থেকে একখানি নৌকোর মাঝ দরিয়াতে—সে ঘুমে ভারি লঙ্গর নামিয়ে স্থির হয়েছে!

জলপাইগুড়ি

দুধারে মাঠ বলে উঠেছে রাত কাটল—রেলগাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটেছে ইস্টিসেনের ঘড়ি কি বলে তাই দেখতে।

শিলিগুড়ি

সারি সারি সবুজ গুল্-বোনা সতরঞ্চ, তারি উপরে একটা মস্ত

কাছিমের খোলা, টিনের তৈরি। রাতের হিমে ভিজে উঠে সেটা টিহি (T. E) শব্দ করছে—সবুজ নিশেনের ইসারা পেয়ে বাচ্ছা ইঞ্জিন চলল মানুষ-বোঝাই ছোট ছোট বাক্সো নিয়ে হিমালয় টপ্কাতে। প্ল্যাটফর্মে টেবিলে-ধরা চায়ের কেট্লি—সে গলা তুলে চেয়ে দেখছে কাণ্ড ইস্টিম ইঞ্জিনের!

সুক্না

ইঞ্জিন সিটি দিয়ে দূরের একটা ঢালু ছাতকে বললে কত বড়ো পাহাড় দেখে নেব! দুর্জয় পাহাড়ের চূড়ো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে বললে—বাসরে তবে তো আমি নেই।

সুক্নার জঙ্গল

দিনদুপুরে নিশুতিরাতের কাজলঢালা গহন বন। বনের তলা রোদে ঝিক্ঝিক্, গাছের আগা চাঁদে চিক্মিক্। গাছ বেড়েছে রূপকথার রূপের লতা, ফুল ধরেছে সকালবেলার সন্ধ্যামণি।

বনপথ

তল-পাহাড়ের বনের ধারে কাঠ-বোঝাই বয়েল গাড়ি থামিয়েছে কাঠুরে—চলন্ত রেলগাড়িতে গলাবন্ধ আর অলস্টার পরা ছোট্ট রাজপুত্রটি ফাঁকে ফাঁকে চোখ দিয়ে মৃগয়া করে চলেছে তীরবেগে পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে।

তিস্তা

আকাশের নীল, পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে পড়েছে, পাহাড়ের নীল বনের ধারে বিছিয়ে গিয়েছে; বনের নীল বালিয়াড়ির বুকের পথে বইছে কূলহারা সমুদ্রজলের স্বপ্ন দেখতে দেখতে!

পাহাড়তলি

সকালের কুয়াশা হিমে মন্থর—মাঠ ছেড়ে সে যেতেই চায় না! বালির বুকে নদীর ধারা শীতে মন্থর—চলতেই চায় না পাহাড়তলি ছেড়ে। গাড়ি ছুটেছে তো ছুটেইছে—থামতেই চায় না!

পর্বত

মন বলে দিন-দুপুর, বন বলে নিশুতি-রাত! বনের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ বলে শরৎকাল, গাছের পাতায় পাতায় ঝিঁঝি বলে বর্ষা যায় নি বৃষ্টি থামে নি মেঘ লেগেছে দিকে দিকে!

তল-পাহাড়ের বনের ধারে তালাবন্ধ ভাঙ্গা ঘর। দাওয়ায় বসে একটা ভুলো কুকুর কান চুল্‌কোচ্ছে।

রেলগাড়ি সেখানে এসে কি ভেবে হটাৎ দাঁড়িয়ে গেল!

গাড়ির মধ্যে গলাবন্ধ আর অলস্টার-মোড়া ছোট্ট রাজপুত্র একটা কমলালেবু টপ্ করে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠল—বাগা মামা! ইঞ্জিন অম্‌নি বাঁশি বাজিয়ে দিলে, গাড়িও হেলতে দুলতে নাচতে নাচতে বনের দিকে এগোল।

তালাবন্ধ বাড়ি ছুটে পালাল, বনের গাছ তারাও, ভুলো বসে বসে কান চুলকোতেই থাকল ঠিক যেখানকার সেখানে, নড়লও না!

দেখা বন, সারি সারি গাছ সেখানে পাহারা দিচ্ছে, এরি পরেই রূপ-কথার বন। যাবার বেলায় সেখানের গাছগুলো সব ঘুরে ঘুরে দৌড়ে নামে তরাই ক্ষেতে। আসার বেলা গাছ সব দৌড়ে ওঠে চড়াই পথে! চাঁদের আলো পড়ে সেখানে গাছের শিয়রে, শিকড়ে এসে লাগে তাদের দিন-দুপুরের রোদ। সকালের কুঁড়িতে সেখানে সন্ধ্যামণি ফুল ফোটে, সেখান থেকে কাঠকুড়ুনি এক রানী সে দেখে বনের উপর দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট খেলার গাড়ি বাঁশি দিতে দিতে গিয়ে থামল পাহাড়ের একটা মোড়ে।

গাড়ি থেকে উঁকি দিয়ে রাজপুত্র দেখেন, কাঠকুড়ুনি চলতে চলতে মিলিয়ে গেল বনের ছায়ায়!

পেটা লোহার সরু একখানা মই, তারি তলায় পেরেকে-গাঁথা এক-ফালি সরু পথ। অতল খাতের ধারে পথটা পাছে পাহাড় থেকে পিছলে পড়ে তাই একটা মস্ত পাথর পিঠ দিয়ে তাকে ঠেসে ধরেছে। পাহাড়ের সঙ্গে এরি উপর দিয়ে রেল নির্ভয়ে দৌড়োয়, পাহাড়ি ঝাউ ইস্ ইস্ বলে আর পাহাড়ি বাঁশঝাড় হাত বাড়িয়ে মোড়ে মোড়ে গাড়িগুলোকে ক্রমাগত সাম্লাতে চলে।

কাছে স্টেশন ঘর, কোথাও কিছু নেই। গাড়িগুলো সেখানে হটাৎ নিশেন হাতে একটা লোক দেখে চম্‌কে পিছন হটে গড় গড় করে খানিক নীচের পাহাড়ে গড়িয়ে প'ড়ে থেমে থাকে বনের মাঝে। শীতের কুয়াশা তল-পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে আসে--কি হল দেখতে!

সুন্‌সান্ বনের তলা। সোনা রুপোর গাছে পাতায় পাতায় রোদ ঝিক্‌ঝিক্ করছে। রেলরাস্তার স্তূপাকার ঢেলা দেখাদেখি খানিক বালি আর আবোর মেখে যেন রোদ পোহাতে লেগেছে এমনি ভাব দেখাচ্ছে!

ইস্পাতে কাটা একটা 'দ' রোদ পোহাচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে কাত হয়ে পড়ে আছে সেখানে গাড়িগুলোর ঝুঁটি ধরে টানে একটা ইঞ্জিন, পিঠে ধাক্কা মারে আর একটা, আর বলে--পড়বি নে চল্!

বনের মধ্যে সরু দুটো তারের ফাঁসি—পড়ে আছে তো পড়েই আছে। তার উপর দিয়ে ইঞ্জিনে আর গাড়িগুলোতে ওঠা-নামা খেলা দুবেলা চলছে!

খাঁচার মতো কয়েকটা কাঠের ঘর, কিন্তু তাকে ঘিরে বসেই আছে

কতদিন তার ঠিক নেই—ফাঁসে কি পড়ে তাই দেখতে গাছের ছাওয়া, মেঘলা দিনের হাওয়া আসছে যাচ্ছে—

কিছুই দেখা যায় না, তার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে রেলগাড়ি হটাৎ একটা ঘরের মধ্যে এসে পড়ায় সেখানে দেয়ালের গায়ে বড়ো বড়ো করে লেখা—মহানদী। জল ঝরার শব্দ নেই। শুধু একটা পাহাড়ের মোড়ে গাঁথা চৌবাচ্ছা।
বাচ্ছা ইঞ্জিন গাড়িগুলোকে একলা ফেলে দৌড়ে যায় সেদিকে জল খেয়ে নিতে!

অপরিচয় ঢেউ দিয়ে উঠেছে সামনে,—পরিচিত অতি-পরিচিত দুটো পাশাপাশি টানা ইস্পাতের লাইন ধরে যাত্রিবোঝাই গাড়ি ছুটেছে এরি দিকে, কিন্তু ছুটে ছুটে পথের শেষ পাচ্ছে না!

পাহাড়ের নীল চন্দন গড়িয়ে পড়েছে পাহাড়তলির বালিয়াড়ির বুকে, নীল আকাশের স্বপ্ন রেখা রচনা করে। এর সঙ্গে মিলেছে গত বর্ষার ভরা নদীর বুকের তলায় নীল সমুদ্রের যে স্বপ্ন লুকিয়ে ছিল তারই সজল নীল।

নিথর নীল জল রাত্রির সমান স্তব্ধ, কুল পায় না কিনারা পায় না, ঘাট আঘাট আরম্ভ শেষ কিছুই পায় না। কেবলি মাঝ দরিয়া, কেবলি একলা মাঝি ঘুমে ভারি নৌকো ভাসিয়ে—

ভাদরের ভরা নদী নেই, পাহাড়তলায় বালিয়াড়ি, তারি বুক জুড়িয়ে শরতের আলোয় ঝিল্‌মিল্‌ স্রোতের তলাকার অতল-নীল ভাবনা!

প্রথম যুগের ফুল দোল—উত্তর পর্বতে তারি হিল্লোল—অপরাজিতার নিস্পন্দ নীল, মালতীফুলের হিমে-ঢালা নীল, গভীর জলে ছায়া-পদ্মের নীল!

আলো-করা শরতের মেঘ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বকের পাঁতি উড়ে উড়ে যায় মাঠের ধারে ধারে, বাঁধে কুয়াশার তলায় শিশিরে-ভেজা শ্বেতপদ্মের কলি; তারা স্থির হয়ে থাকে ঘুমন্ত আর এক ঝাঁক পাখির মতো!

উত্তর পর্বতের মেঘ আর কুয়াশাতে নিরন্তর দিক্, এরি বুকে পাষাণে-গড়া চারটি মিনার—আলিফ্ অক্ষরের মত সরল সুন্দর। এরি একটি মিনার সেই শুধু বলে মানুষের গলার সুরে সুরে—"লা-ইলাহ-ইল্লাল্লা" এরি প্রতিধ্বনি দেয় উত্তরের পর্বত-চূড়া একের পরে এক সকালে, সন্ধ্যায়, রাতে।

উত্তরে তুষার-পর্বতের নিশ্চল তরঙ্গ, দক্ষিণে পাহাড়তলায় যতদূর দেখা যায় কেবলি মেঘ আর কুয়াশার সমুদ্র, এরি মাঝখানে একটি কালো পাথর আর তাকে জড়িয়ে একটি বনলতা।
পাথর সে কাঞ্চনশৃঙ্গের দিকে চেয়ে সকাল-সন্ধ্যা সোনার আলো-মাখা মস্ত একটা স্বপ্ন দেখলে আর বনলতা সে পাহাড়-তলার দিকে চেয়ে মেঘ-সমুদ্রের তলাকার সবুজ বন আর ধানে-ভরা মাঠের স্বপ্ন দেখলে! এই দুই স্বপ্ন এক হয়ে একটি সোনার পাতার রূপ ধরে বেরিয়ে এল—গোপন একটি ঝরনার ধারে!
উত্তর থেকে হিম-বাতাস কাঞ্চনশৃঙ্গের কথা তার কানে কানে বলে যায়, পাহাড়তলি থেকে মেঘ উঠে এসে তাকে সবুজ বনের খবর জানায়, সবুজ বৃন্তে বাঁধা সোনার পাতার মন পাথরের উপর থেকে উঁকি দেয় এদিকে ওদিকে, ঝরনা সে দিনরাত শুনিয়ে চলে তাকে অকূল কালো জলের ডাক।

ঊষার আলো শীত-কাতর পাখির মতো প্রহরের পর প্রহর চুপ করে সামনের পাহাড়ে বসে আছে, বরফের একটা চূড়া আকাশের ঠেস দিয়ে স্থির হয়ে হারানো সূর্যের ধ্যান করছে—একটা ঝরনার পাথর তরায়ের জঙ্গলে ছোট একটি নদীর দিকে ঝুকে রয়েছে, আর একটা পাতা-ঝরা শীতের গাছ দেখছে চুপটি করে—রঙিন প্রজাপতির মত একদল বাগানের কুলি চা-ক্ষেতে উড়ে বসেছে।

রেশ

একটুখানি সুর, মানুষের সংগীত-শাস্ত্র যার খোঁজই রাখে না এমন একটি চমৎকার রাগিনী! পাহাড়ের গায়ে ঘন বন তারি পাশ দিয়ে ঝরনা-ধারা পাথর ভিজিয়ে দিনরাত ঝরছে, সেই পাথরের উপরটিতে বসে এক অজানা পাখি নতুন এই ভোরাই আলাপ করে। শুনতে শুনতে আকাশের ঘুম ভাঙে, আলো আস্তে আস্তে জাগে,—অজানা পাখির গান থেমে যায়, শুধু তার ছোট সুরের রেশ গিয়ে বাজতে থাকে দিগন্তের মেঘস্তরে দূরে দূরে গিরিশ্রেণীর প্রত্যেক পাথরের বুকে! দিনের চোখে লাগে রঙের নেশা, রাত চলে যায় প্রদীপ নিভিয়ে নতুন সকালে নতুনের সন্ধানে অতীতের পুরাতন পথ বেয়ে। এরই রেশ ফুলের বুকে পাতার শিরায় শিরায় লেগে থাকে শিশিরবিন্দুর ছলে বনপথের দুই ধারে। কে জানে সে কত যুগ হল, যেদিন প্রথম সকাল হল এই ঝরনার ধারে এই পাহাড়ে, সেই থেকে একটির পর একটি পাখি আসে ঐখানটিতে, গায় ওই একটি প্রভাতী! একটির পর একটি রাত আসে, চলে যায় বিদায় হয়ে নতুন সকালে পাহাড়ের কাছ থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে!

ঝরনা

উপরের বন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আব্ছায়া দেখা যাচ্ছে—এই ছায়াপুরী থেকে একটি ঝরনা-ধারা রৌদ্রমাখা নীচের বনে নেমে চলেছে—উপরের মানুষ ঝরনাজলে ময়লা কাপড়ে ধোপ্ দিচ্ছে—নীচের মানুষ একটা কসাই, ঝরনার বুকের ধারে একটা শিলাতলে বসে আপনার ছুরি শানাচ্ছে—একটা বানর দুই জনের মাঝে, পাতায় পাতায় সবুজ পেয়ারা গাছের ডালে বসে সূর্যোদয়ের নিচে দিয়ে সরু একটি আঁকা বাঁকা আলোর রেখা টেনে টেনে ঝরনা যেখানে মহানদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে—সেই সুদূরে চেয়ে চুপটি করে বসে কি যেন ভাবছে!

দক্ষিণে পাহাড়তলায় যতদূর দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত নিশ্চল মেঘ-

সমুদ্র, উত্তরে তুষার-পর্বতের অচল ঢেউ, তারই মাঝে একখানি কালো পাথর আর তার গলা জড়িয়ে একটি বনলতা! পাথর সে কাঞ্চন-শৃঙ্গের দিকে চেয়ে সকাল সন্ধ্যা সোনার স্বপ্ন দেখেছে, বনলতা পাহাড়তলার দিকে চেয়ে মেঘ-সমুদ্রের তলায় যে সবুজ বন সবুজ মাঠ লুকিয়ে আছে, তারি স্বপন দেখেছে, এই দুজনের স্বপ্ন একটি সোনার পাতার রূপ ধরে বেরিয়ে এল গহন বনের গোপন একটি ঝরনার কিনারায়! উত্তর থেকে হিম বাতাস তুষার পর্বতের কথা তার কানে কানে বলে যায়, পাহাড়তলির মেঘ তার কাছে এসে সবুজ বনের খবর দিয়ে সবুজ বৃন্তে বাঁধা সোনার পাতা কালো পাথরের বুক আঁকড়ে সকালের আলোয় এদিক চায়, ওদিক চায়—ঝরনা তাকে অকূল কালো জলের ডাক শুনিয়ে চলে দিনরাত।

দেওয়ালি

কাল রাতে চাঁদ ছিল না, পাহাড়ে পাহাড়ে দীপালি উৎসব করেছে মানুষরা মিলে, পরবের আতসবাজি আর ঢাকের শব্দ দুপুর রাতের পাহাড়ের সুপ্তি ভেঙে দিয়ে রাতের গায়ে ক্রমাগত আঘাত দিয়েছে, বনের সুষুপ্তি নষ্ট করে দিয়েছে। নীল রাত্রির বুকের উপরে মানুষের দেওয়া আগুনের মালা থেকে একটির পর একটি ফুলকি নিভিয়ে দেওয়ালির রাত চলে গেল কখন কেউ দেখলে না, সকালের আলো হিমালয়ের শিখর বেয়ে নেমে এসে দাঁড়াল উৎসবের অবসাদে কাতর মানুষের ঘরের দরজায়। ঊষার দুখানি অরুণ চরণের অলক্তক-রাগ পথের উপরে ধুলায় পড়ে রইল, সবার অসাক্ষাতে আকাশের মেঘ এসে লুটিয়ে পড়ল মানুষের এই চলাচলের পথে। পথের উপরে গোলাপি রঙের রেশ দিয়ে সাদা আঁচল ভর্তি করে নিয়ে চলে গেল সে দূর দিগন্তের পারে—যেখানে সকালে আলোক-সমুদ্রের ঢেউ উঠেছে রাতের দেওয়ালির অবসানে।

খনি-তলায় লুকিয়ে আছে মণি। পাহাড়ের পথে কাঁকর সকালের আলোয় সূর্যকান্ত মণির মরীচিকা দেখিয়ে বলে, আমাদের

তুলে দেখ না! পথে-বিপথে আমি নুড়ি আর পাথর কুড়িয়ে চলি। অন্য পথিক তারা চলে বনের ফুল পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে, আমাকে ভাবে এরা পাগল। শুকনো ঝরনার পাথরের বুক ফেটে যে কথা বার হচ্ছে এরা কি তা শুনতে পায় না! ঐ যে একটা পাহাড়ি, পথের মাঝে কার ঝুড়ি থেকে পড়ে-যাওয়া একটুকরো কয়লা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে চলেছে, আর এই যে আমি ঝরনার বিরহে যার বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে এমন এক টুক্‌রো পাষাণ কুড়িয়ে নিয়ে চলেছি—এই দুজন-কেই এই পাহাড় ভালো করেই চিনে রাখছে।

খানকতক মরচে-ধরা টিন আর বাক্‌সো ভাঙা তক্তা, তাই দিয়ে ঘর-খানি বেঁধেছে সুন্দর করে পাহাড়িয়া দোকানি। রাস্তার মোড়ে ঘর, শুক্‌নো একটা ঝরনার বাঁকে একটুখানি বাগান তাতে দু-চারটে গাঁদা ফুলের গাছ—সেইখানে একটা মুরগি গোটাকতক বাচ্ছা চরিয়ে বেড়াচ্ছে—এদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—একটা সাদা পায়রা—উড়তে ভুলে গেছে সে! টিনের ছাদের উপর দিয়ে বরফের পাহাড় দেখা যায়। থেকে থেকে হিম-বাতাসের ঢেউ সেদিক থেকে বইছে—দূর-দূরান্তর থেকে যাত্রী পাখি দলে দলে এই উত্তরের বাতাসে পাখা মেলিয়ে উড়ে গেল দূর থেকে দূরে পাহাড়তলি ছাড়িয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের মাঝে কোনো এক সবুজ দ্বীপের সন্ধানে। পোষা পায়রা গিয়ে চুপ্‌টি করে ঘুমোতে বসল বরফের মতো সাদা ডানায় মুখ লুকিয়ে কেরোসিনের বাক্‌সোয় কাটা ছোট্ট একটা খোপে।

মানুষের মুখ এপাশ থেকে দেখি ওপাশ থেকে দেখি একই মুখ—বদল নেই! আর এই চলার পথ—এর এমুখ ধরে দেখতে দেখতে যাই এক দৃশ্য, ওমুখ ধরে দেখতে দেখতে ফিরি আর এক দৃশ্য, যেতে আসতে নতুন হ'য়ে দেখা দেয় এই পাহাড় পথ।

আগে পিছে দুর্গম দুর্জয় পর্বত, তার মাঝ দিয়ে চা-বাগানের শুঁড়িপথটি গভীর খাদের বুকে যেখানে রাতের কুয়াশা জমাট

বেঁধে রয়েছে তারি তলায় ডুব দিয়েছে। সেই কুয়াশার আড়াল থেকে একটি সানাই সুরে বলে যাচ্ছে শুনছি—সুদূর পাহাড়তলির অজানা গাঁয়ের না-দেখা বর কনের বিয়ের কথা! সকালের হাওয়া কুয়াশার পর্দা হটাৎ খুলে দিয়ে গেল। রোদ-ঢালা সবুজ পাহাড়ের ঢালুর উপরে একখানি ছোট গ্রাম। তার পথ ঘাট দুয়োর নিয়ে হটাৎ দেখা দিলে একেবারে চোখের গোড়ায়। রাঙ্গামাটির সরু পথ, সেই পথে একদল লোক আসছে—সঙ্গে বাজনদার বাঁশি বাজিয়ে চলেছে সামনে। একজন শুক্‌নো ফুল ছড়াচ্ছে—পিছনে আসছে চাদরে-ঢাকা মৃতদেহ, সকালের আলো সাদা চাদরের উপরে ধরা ছোট্ট একটি রাঙা টুপির কিনারায় ঝিক্‌মিক্‌ করছে।

গোলাপি ঘাঘরা নীল ওড়না, নীল ঘার্ঘরি তার উপরে জাফরানি ঘোম্‌টা—এমনি নানা রঙের প্রজাপতির মতো পাহাড়ি মেয়ে চা বাগানের সবুজ ঝোপের উপরে উড়ে বসেছে। নীল আকাশের আলো নীচের পাহাড়ে বেগুনি রঙের গাঢ় প্রলেপ মাখিয়ে দিয়েছে, উপরের পাহাড়ে কচি পাতার রঙে ছোপানো রোদের ঘোম্‌টা, সমস্ত চা ক্ষেতগুলো দেখাচ্ছে যেন গেরুয়ার উপরে চাকা চাকা সবুজের ছোপ-ধরানো গুল্‌বাহার এক একখানি শাড়ি, অতি যত্নে মানুষ পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে দিয়েছে। এই যতনের চা-ক্ষেতের ধারে পথের একটা বাঁকে একঝাড় বাঁশ, তারি দুটি পাতার মধ্যে দিয়ে ধবলাগিরি দেখা যায়, সেইখানে একটা কতকালের কালো পাথরকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে অযতনের একটি চা গাছ শীতে সমস্ত সবুজ পাতা ঝরিয়ে দিয়ে ডালে ডালে ফুল আর ফল ধরিয়ে চেয়ে আছে উত্তর মুখে, তার আশেপাশে ঘাসের ফুল গোলাপি নীল পীলা ছোট ছোট, যেন আকাশের তারা ফুল হয়ে নেমে এসেছে—শুধু পাতায়-পাতায় সবুজ যতনের চা-বাগানের পথের ধারে!

দুর্গম পর্বতশিখর যেখানে একেবারে বরফের গায়ে কালো ঢেউ দিয়ে দাঁড়িয়ে, সেইখান থেকে নেমে এসেছে দুজনে এরা স্ত্রী পুরুষে নীচের পাহাড়ের হাটে। মাথায় চামড়ার টুপি, গায়ে কম্বল, কোমর

থেকে চামর দুলছে,—মেয়েটি চলেছে পিঠে একটা ঝুড়িতে গোটা দুই ছেলে বয়ে, পুরুষ চলেছে একটা দুন্দুভি বাজিয়ে। তুষার পর্বতের রুক্ষ বাতাস এদের মুখে পাকা বাদাম পাতার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে। উপর-পাহাড়ের মানুষ এরা দেবদারু গাছের মত সিধে সরল, ছোট পাহাড়ের মানুষ এদের কাছে ছোট দেখাচ্ছে! মেঘ-গম্ভীর দুন্দুভির শব্দে ছোট ছোট দোকানঘরের টিনের ছাত কাঁপিয়ে পুরুষ নাচ সুরু করলে ঘূর্ণি বাতাসের ছন্দ রূপ ধরে ঘুরে চলল, মেয়েটি গান ধরলে ঝড়ের রাতের প্রচণ্ড বাতাসের একটানা ক্রন্দন-ধ্বনি হাটের কোলাহল ডুবিয়ে দিয়ে হটাৎ জেগে উঠল।

এই পাহাড়ে পাহাড়ি নাচ গান কেউ পছন্দ করে না—বাঁশিতে ছেলেরা বিলিতি গৎ ফোঁকে, রাস্তার ধারে চিনামা হাউস, সেখান থেকে থিয়েটারের গান শিখে পাথর ভেঙে চলে মেয়েরা "এমনি করে ধরবো ধনু মারবো বিষের বাণ" বেসুরে গাইতে গাইতে। কাজেই হাটে এসে এরা শুধু হাতে ঘুরে বেড়াতেই থাকল পাহাড়িয়া নর্তক-নর্তকী!

রোদে-তপ্ত পাথরের উপরে এতটুকু একটি জংলি গাছ—অনেক উপর থেকে ছায়া ফেলেছে, সেই ছোট ছায়ার গণ্ডীর মধ্যে ধরা পড়ল ঝরনার সুশীতল পরশ, দূর পাহাড়ের চোখ জোড়ালো নীল নতুন-ফোটা বনফুলে, মন-ভোলানো পরিমল! আর পাহাড়িদের চলাচলের রাস্তায় তাদের বসত-বাড়িগুলো বড়ো বড়ো ছায়া ফেলেছে, পাঁক হয়ে সেই ছায়া সাদা কালো একজোড়া হাঁসের ডানার আগায় লেগে আছে!

উষার আলো শীতকাতর পাখির মতো প্রহরের পর প্রহর ধরে চুপ করে সামনের পাহাড়ে একগোছা কচি বাঁশের আড়ালে বসে আছে। বরফের একটা চূড়া আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে হারানো সূর্যের স্বপন দেখছে, আর একটা চূড়া তরায়ের জঙ্গলে ছোট একটি নদীর দিকে ঝুঁকে দেখছে চুপটি করে, আর একটা পাহাড়ি ফুলগাছ চেয়ে রয়েছে চুপটি করে [illegible]তের দিকে, সেখানে রঙিন প্রজাপতির

মত একদল মেয়ে কাজ করতে নেমেছে।

পূবে পাহাড়তলিতে নিবিড় কুয়াশা স্থির হয়ে আছে, উপরে সমস্ত উত্তর-আকাশ নেবু ফুলের বুকের ভিতরের রঙ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে, হরিদ্রা মণির মতো তরল আভা বরফের পাহাড়কে এসে আলিঙ্গন করলে। সকালের বাতাসে দেবদারু বনের ঘুম ভেঙেছে কি পর্বতে পর্বতে দিকে দিকে ঘন মেঘের পর্দা পড়ে গেল, দিনের আলো ফিরে গেল উত্তর পর্বত ছেড়ে সুদূর পূর্ব দিগন্তের পারে—যেখানে রাতের চাঁদ উদয়গিরির ওপারের আকাশে কুন্দফুলের রঙ ধরিয়েছে।

ঝরনার পাখি শেষ রাতের আলো-আঁধারে লুকিয়ে এসে গান গেয়ে ঘুম ভাঙায়, পাহাড়ে কারো কাছে তার রূপ ধরা দিলে না, রঙ ধরা দিলে না, ধরা দিলে শুধু তার সুরটুকু—তাই দিয়ে তাকে চিনতে হয়। প্রতিপদের চাঁদের আলোর মতো এতটুকু ঝরনাধারা ছোট এক-খানি পাথরকে মালার মতো বেড়ে নিয়েছে অরণ্যের মাঝে অন্ধকারের বুকে। ভোরের পাখি রাত থাকতে আসে যায় ঝরনার বুকে তার রূপের ছায়া কোনোদিন পড়ে না, ঝরনা শুধু তার সুরটুকু মনে রেখে চিনে নেয় ঝরনাতলার পিয়াসী-পাখিকে। ঝরনার বুকের পাথর অন্ধকারে অচিন পাখি তার উপরে এসে বসে, অন্ধ বধির পাষাণ তার পায়ের পরশটুকু পায়,—সে তাই দিয়ে আপন পাখিকে চিনে নেয়।

আমার ঘরের বোঝা যা কিছু ঘরেই রেখে একা পাহাড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি বিদেশের মানুষ—আর পাহাড়ের মানুষ তারা কে জানে কাদের ঘরের মস্ত মস্ত বোঝা বয়ে পাহাড়-পথে উঠছে নামছে!

পাহাড়ের রাস্তায় যাবার বেলায় হোটেলের কাছটা পর্যন্ত পা খুব দৌড়ে চলে, হোটেলের সীমানা পার হয়েই মন দৌড়োতে থাকে পাহাড়ের একটার পর একটা বাঁক ঘুরতে ঘুরতে বরফের পাহাড়ের দিকে, ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে চায় আর রইতে বলতে থাকে মনকে।

বাড়ি-মুখে ফেরবার বেলায় পা চলে দৌড়ে আগে পেঁছতে, মন চায় না পাহাড়ে ঝরনা ছেড়ে যেতে। তখন সে পা'কে বলে রয়ে-বসে চলতে, ঘরে পেঁছে পা বলে মনকে—"নাও এইবার বসে ছবি লেখো, মন বলে তাড়া কিসের, তুমি একটু সামলে যাও না তার পরে দেখা যাবে।"

চিম্‌নি, চা বাগানের কারখানা, সিফাই ঝোরা, মহানদী, এই হ'ল আমার সঙ্গীটির দৌড়। মাইল হিসেবে আমার দৌড়ের চারগুণ হবে। মহানদীর একটি চুণোপুঁটিও ধরতে পারলেন না আজও সঙ্গী-মশায়! আর দু-পা না যেতে-যেতে পথের থেকে কুড়িয়ে পাই এত যে আমার পকেট বুক ভর্তি হ'য়ে যায় রোজ রোজ। আমার সঙ্গী চলেন লক্ষ্যভেদ করে সোজা কোনো দিকে না চেয়ে, আমি চলি সঙ্গীর চোখে যা কিছু এড়িয়ে যায় তাতেই ঠেকতে ঠেকতে, এঁকতে বেঁকতে সঙ্গীকে অনুসরণ করে।

শীতের মাঝে কাল রাতে ধারাশ্রাবণ পাহাড়ে হঠাৎ দেখা দিয়ে গেছে, গাছপালা সকালে সবুজ রঙে ধোয়া বর্ষার সাজ পরে উৎসবে বার হয়েছে। ঝরনা আজ তার সমুদ্রকে ভুলে মেঘের কথা শোনাচ্ছে ঝাউবনকে!

•

সকাল সন্ধ্যা কত রঙই লাগে বরফের পাহাড়ে। রাতের কাজল তাকে মলিন করে দেয়, কিন্তু কোনো রঙ কোনো মলিনতা লেগে থাকতে পায় না তার গায়ে, সে যে-সাদা সেই-সাদাই থাকে! এই সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী এদের উপর দিয়ে ঝড় বহে যায়, কুয়াশা এসে একে বারে বারে আচ্ছন্ন করে—পাহাড় যে-সবুজ সেই-সবুজই থাকে, কিছুতেই তার রঙ বদ্‌লায় না। মানুষ বিচিত্রতা ভালোবাসে তাই সাদার উপরের রঙ-সাজ দেখতে ছোটে সে, রঙের উপরে সাদা মেঘের আবরণ দেখতে দেখতে ভুলে যায় সে, পর্বতের বিনা-সাজের রূপ কেমন, তা সে দেখতেই চায় না!

রোদে-পোড়া উপর পাহাড়ের এক গোছা ঘাস নীল আকাশ থেকে ঝুঁকে দেখছে অনেক নীচে জলে-ভরা একখানি মেঘ ঝরনার পথ ধরে আস্তে আস্তে উঠে আসছে তার দিকে।

পথের ধারে পদম্ গাছ শীতের আরম্ভে অরুণোদয়ের দিকে চেয়ে এতটুকু একটি গোলাপি কুঁড়ির স্বপ্ন দেখছে। ও-ধারের কালো পাহাড় তুষার-পর্বতের ছেড়ে-ফেলা রঙিন উত্তরীয় নিজের মাথায় জড়িয়ে নিয়ে হিমগিরির দিকে পিট ফিরিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে পদম্ গাছের দিকে চেয়ে।

বাজারের ধারে সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে একখানি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তরকারিওয়ালি ডাকছে—পোখ্‌লী পোখ্‌লী। পোখ্‌লী সে ছাগলছানা, কি একটা ছোট্ট কানঢাকা টুপি-পরা পাহাড়ি ছেলে, না নীল ঘাগরি, পীলা চাদর-পরা একটি মেয়ে তা বোঝা গেল না। শুধু জানলেম পৌষ মাসে কুয়াশার মধ্যে একদিন সে জন্মেছিল, আজ শীতের সন্ধ্যায় ঘন কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের কোন্ একটা কোণে খেলতে বার হয়ে গেছে—এখনো তার দেখা নেই!

দিন চলে যাচ্ছে দুধ কমলা-গোলা একখানি মেঘের পর্দার আড়ালে সমস্ত পাহাড় ঢেকে দিয়ে। এই প্রজাপতির ডানার চেয়ে হাল্‌কা ও স্বচ্ছ মেঘের মধ্যে দিয়ে অস্তমান সূর্যের গায়ে সুদূর পাহাড়ের উপরের একটি গাছের কাজল রূপ, সোনার পটে তুলি দিয়ে টানা দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ি মেয়ের রঙিন ওড়নার আড়ালে তার সোনার কানখানির মতো দুলছে সূর্যমণ্ডল। হটাৎ মেঘের মধ্যে থেকে একটা গ্রামোফোন—'আমার জন্মভূমি' বলে একটা স্বদেশী গান কর্কশ গলায় গেয়ে উঠল।

উত্তর-আকাশ জুড়ে ধূমল বর্ণের চন্দ্রাতপ। তারি তলায় গভীর রাতের ঘননীল অন্ধকার দিয়ে বোনা শীত বসন্তের রাজা-বেশ প'রে পর্বত দেখা দিয়েছেন। কচি পাতায় সবুজ সাজে সেজে এসে শীতের

গাছ সকালের দরবারের মাঝে হটাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পর্বতের দিকে চেয়ে আছে, তার বুকের পাখি গান ভুলে স্তব্ধ হয়ে গেছে আজ সকালে।

উপরে মেঘের নীচে মেঘ, তারি ফাঁকে দুটি পাহাড় ঝুঁকে পড়েছে একটি নদীর দুই পারে। বহু দূরে সে নদীতে কে যে জাল ফেলে তা দেখা যায় না, কিন্তু সেখান থেকে মাছ দিতে আসে অন্নপূর্ণার মতো রূপবতী পাহাড়ি মেয়েটি—একে দেখে ভুলে থাকতে ভুল হয়ে যায় তাদের, যারা মনে-পড়া মনে-না-পড়া দুই পর্দার ফাঁক দিয়ে রোজ চেয়ে থাকে আমার দিকে।

পাহাড়ের উপর পোলো খেলা, তাই দেখতে দলে দলে পাহাড়ি মেয়ে ভেঙে পড়ল। বৈকালের ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তারা হাসি খুশি করতে করতে ফিরছে, সবার গায়ে নতুন নতুন সাজের বাহার। শুধু একটি মেয়ে এসেছিল দুহাতে দুই ভাই বোন, পিঠে একটি কচি ছেলে বয়ে রুখো মাথায় গায়ে একখানি মলিন চাদর জড়িয়ে। তার সাজা ছিল তার মুখের হাসি, তারি সুর দিয়ে কুয়াশায় ঢাকা পথ সে আলো করে দিয়ে চলে গেল!

পর্বত চোখের আড়াল হতেই সূর্যাস্ত শীতের কুয়াশাকে আপনার মনের কথা জানিয়ে গেল। ঝরে-পড়া গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো সেই কথা জলে-ভেজা সাদা আঁচলে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল কুয়াশা—রাত্রি মুখে ছায়া-পথের দিকে অভিসারে।

কাজল রাতের বুকে সোনার তরী—প্রতিপদের চাঁদ সে স্বপ্নের পসরা বহে আসতে আসতে পর্বতের একখানা পাথরে ঠেকে অতল আলোক-সাগরে তলিয়ে গেল।
ঝরনাতলার ঝাউবন নিশ্বাস ফেলে এইকথা জানিয়ে দিলে শীতের কুয়াশায় কাতর চন্দ্রমল্লিকার মত শুকতারাটিকে।

সারাদিনের মধ্যে সূর্যমুখী ফুলের সঙ্গে আজ সূর্যের দেখা হয় কি না এই কথাটি পর্বতের চূড়ায় সোনালি কুশাঙ্কুরকে ভ্রমর এসে শুনিয়ে গেল প্রত্যুষেই।

বেলাশেষে উত্তর দিক্‌বধূ হিম আর কুয়াশার আঁচলে মুখ ঝেঁপে অস্তাচলের দিকে অভিসারে চলেছিল। পূবের পাহাড়ে সূর্যোদয়ের কাঁচা সোনায় মাখা সূর্যমুখী ফুলের বনের দিকে চেয়ে হটাৎ সে থম্‌কে দাঁড়িয়েছে।

সকালে আলোকে ধরে রাখলে একটি সূর্যমুখী কুয়াশার আঁচল চাপা দিয়ে। সন্ধ্যাদেবী পরতে পেলে না সূর্যের দেওয়া সিন্দুর-রাগ।

অরুণ-সারথির দিকভুল হয়েছে ভোরের কুয়াশায়, নীচের পাহাড়ে সূর্যের হরিতাশ্ব কয়টা ছেড়ে ভোর থাকতে নিজে উঠেছে উত্তরগিরির চূড়ায়, সেখানে দাঁড়িয়ে সে ঘন মেঘস্তরের উপর দিয়ে পেতে চাচ্ছে অস্তাচলের দিশা!

প্রভাত কুয়াশার মধ্যে দিয়ে এসে পথের ধারে কোথা থেকে ঝরে-পড়া একটি বাদাম পাতাকে অনুরাগ জানিয়ে আপনার রঙিন উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে গেছে। এইকথা নিয়ে বাঁশপাতারা নানা কথা বলাবলি করছে—পথের বাঁকে গোলাপ লতার নতুন ফুলটির পাশেই দাঁড়িয়ে।

চা গাছের সাদা ফুলের বুকের আড়ালে সূর্য। সকালের মেঘ পাহাড়ের পর পাহাড় খুঁজে চলেছে হিমাচলের শিখর পর্যন্ত, সূর্যের দেখা পাচ্ছে না।

মেঘের উপরে মিনার, সেখান থেকে আহ্বান পৌঁছে যাচ্ছে হাটে বাজারে, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সবার কাছে। গিরিশ্রেণী এই আহ্বানের প্রতিধ্বনি দিচ্ছে একবার দুবার তিনবার, তিন সন্ধ্যা।

হিমাচলের শীত লেগেছে, বরফের পাহাড় মেঘের তলায় যেখানে মেঘ-ফাটা রোদে আমবুটি গাঁয়ের বাঁশঝাড়ে-ঘেরা ছোট একখানি ঘরের এতটুকু একটি পাহাড়ি মেয়ে ভিজে চুল শুকিয়ে নিচ্ছে, সেইখান-টিতে নেমে এসে সাদা কালো ডোরা-টানা শীতকাতর প্রকাণ্ড একটা হিমাবাঘের মতো চুপটি করে পড়ে আছে!
বাঁশ গাছের ঝোপে দোয়েল পাখি মাছি খেতে এসেছিল, পায়ের শব্দ পাওয়া-মাত্র সে ঝরনা পেরিয়ে চা ক্ষেতের ঢালু বেয়ে সোজা আম-বুটিয়া গাঁ খানার দিকে পালিয়ে গেছে—এই কথা নিয়ে সারাটা পথ কানামাছি ফিরে ফিরে কানের কাছে এল, পথিককে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জ্বালাতন করতে থাকল।

সকালের আকাশের চোখ দুটি কাজল-ঘেরা নীল-ডানা প্রজাপতি হয়ে চা-বাগানের উপর দিয়ে উড়ে যেতে ঘাসের প্রেমে আটকা পড়ে রইল। রাতের হিম এসে ঘাসকে আর তার প্রজাপতিকে একই সঙ্গে চির-কালের মতো ঘুম পাড়িয়ে গেল, ভোরের আলো এসে সে ঘুম ভাঙাতে গিয়ে দেখলে বুড়ো চা-গাছ পথের ধারে দুজনকে ছায়া করে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে, বরফের পাহাড়ের দিকে চেয়ে সকালে ফোটা চা-ফুলের পাপড়িগুলি শিশিরে ভিজে উঠেছে!

পাহাড়ি ঝাউ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে বরফের পাহাড়ের শিখরে শিখরে চাঁদের আলো, নীল আকাশের বুক জুড়ে সন্ধ্যাতারার অসীম বেদনাটুকু দীপ্তি পাচ্ছে।

পাহাড় ভুলে গেছে কিন্তু একখানি পাথরকে সে ভুলতে পারেনি। যে ঝরনা সমুদ্রে গিয়ে মিলল আর ফিরল [না] তাকে যেখান দিয়ে তার কোলের ঝরনা খেলে চলেছিল, সে কোলটি পর্বত ছেড়ে দিয়েছে বাগানের ফুলদের। শুধু সেই একলা পাথর পড়ে থাকল। তার চলে-যাওয়া ঝরনা-জলের পদক্ষেপের অটুট চিহ্নগুলি বুকে ধরে ফুল বাগানের ধারে। কে জানত কবে আকাশপথে তার হারানো ঝরনা চলতে চলতে তাকে দেখে নেমে এল মেঘের রথে। সেই থেকে

একগাছি—শেঁওলি মালা ধ্যানী পাথরকে চিরদিনের মত অম্লান সবুজের স্রোতে ঘিরে নিলে।

সকালে-ফোটা সূর্যমুখী ফুলটিকে নীল আকাশ আলোর খবর এনে দিতে না দিতে প্রথম পৌষের দুরন্ত কুয়াশা দিক্‌-বিদিক্‌ ঘিরে নিলে। হিম-জর্জর সন্ধ্যায় সন্ধ্যার আকাশ চেয়ে দেখলে অস্তমান সূর্যের আগুন-বরণ জয়পতাকা সকালের কুয়াশা ফুলের বনের পায়ের কাছে আস্তে আস্তে নামিয়ে ধরলে।



পাহাড়িয়া : গদ্যছন্দ

পাহাড়িয়া

জেগে ওঠার কিনারায় কিনারায় সুরের পাড় বোনে পাখি,—
একটি পাখি, না-দেখা পাখি, কানে-শোনা পাখি!
উত্তর-পাহাড়ের নিঃশ্বাস-মন্ত্র আগ্‌লে রাখে
কুয়াশার জাদু দিয়ে;
পাখিকে চিনতে দেয় না, দেখতে দেয় না।

যেদিকে বেড়া দিয়েছে সূর্যমুখী ফুলের গাছ,
সেদিক থেকে ছাড়া পেয়ে আসে সুর!
যেখানটায় পাথর ভিজিয়ে ঝরে জল
সে পথ বেয়ে আসে ভোরে ভোরে গান!

রূপ থেকে স্বতন্তরা, বুকভরা, ঘুম-ভাঙানো ভোরাই দিয়ে
পাই আমি পাখিকে,
পেয়ে যায় তাকে হিমে-নিথর উত্তর আকাশ,
পায় কতদূরের নিস্পন্দ-নীল পর্বত;
পেয়ে যায় শীত-কাতর একা হরিণ
রাজোদ্যানে ধরা!

আমারি মতো পরদেশি যে,
আর যার মধ্যে কোনো স্বপ্ন, কোনো কবিত্ব নেই,
সেই আমার গোবিন্দ খানসামা—
সে শুনেছে ভোরে উঠে
গয়লা-পাড়ায় নেমে-চলার পথে;
রোজই শুধোয় সে পাখির খবর,
ফাঁদ পাতার মতলব দেয় সূর্যমুখী-বেড়ার ফাঁকে!

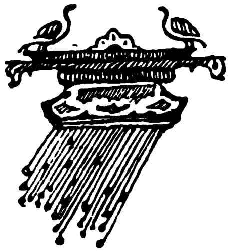
ঝরনা যেখানে সরু একগাছি আলোর মালা দিয়ে
বেড়ে নিয়েছে একখানি পাথর,

ঊষার এই মনের পাখি উড়ে বসে কি সেইখানে?
রাত থাক্‌তে পায় কি পায়ের পরশ
তার শিশিরে-মাজা নিকষ পাষাণ?
বরফ-গলা নতুন নদী—উছ্‌লে পড়ে, উল্‌সে চলে—
সে কি ধ'রে নিয়ে যায় পিয়াসী পাখির রূপের ছায়া?
যুগান্তরের শীতের সকাল অকাল-বসন্তের ভোর রাতে
পেয়েছিল যাকে
সেদিনের ঝরনা-তলায় নতুন ঝাউবনে,—
কোথা হতে এল সে-পাখি কে জানে তা?



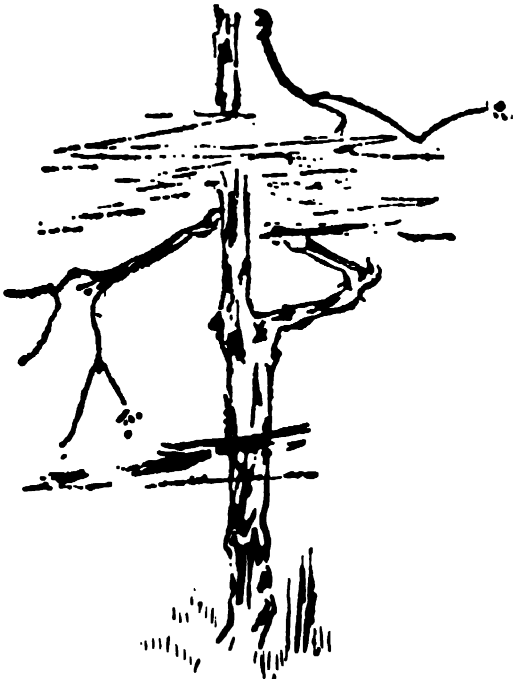
আজকের ভোরাই ধ'রে যে-পাখি করে আসা-যাওয়া
ঘুম-ভাঙানোর বেলায়
অস্বচ্ছ কাচমোড়া আমার এই খোপ্‌টার বাইরে,
সে কি ঝরনার পাখি, না ঝাউবনের, না উপর পাহাড়ের
না ওই পাহাড়তলার চা-বাগিচার নীচের জঙ্গলের?
সে কি থাকে একলা কোনো পাথরের ফাটলে,
না সে বাসা নিয়েছে আমার সঙ্গে কাচমোড়া ঘরেই?

ঘরের কোণে কাচের বুদ্‌বুদে ধরা নিভন্ত-বাতি
সে কি জেনেছে পাখিকে?—
কাজল দিয়ে শেষ রাতে কেন লিখেছে সে
দেয়ালের ভিতর-দিকটায়
রাত-পোহানো পাখীর কালো পাখ্‌নার
ইসারা একটু?



রং-মহল

হাল-ফেশানের শিষ্‌মহল,
শুধু কাচ আর কাঠ আর টিন;—
যেন একটা কাফুন,
দু'চার দিনের হঠাৎ-নবাবীর ফুল্‌কি-কাচের কাফুন-
উইধরা, মর্‌চে-পড়া,
পাহাড় জুড়ে প'ড়ে আছে দেবদারুবনে।



দেবদারু এ, বাদল-ছোঁওয়া,
প্রথম যুগের সবুজ দাবানল,
কইচে পুরোনো দিনের বিজ্‌লি-পাখির কথা;
এরা কি রাখে কোনো খবর এই শিষ্‌মহলের ?

ভাঙা বাগানে দেবদারু রয় রয়, আচমকা দুলে ওঠে,
পাহাড় সে রঙের নেশায় মেতে ওঠে যেন!
মাতন্ মেঘে-মেঘে,
মাতামাতি পাথরে-পাথরে,
তুফান তুলে রৌদ্র-ছায়ায়
মাতামাতি মহাবনে।



পাহাড়িয়া-বাসিন্দা, দুর্মদ এরা,
নীল-মদে মত্ত আছে দিন-রাতই।
প্রচন্ড উল্লাস এদের,—
আকাশ ছাড়িয়ে উঠতে চায়,

ঝরনা দিয়ে ব'হে চলে
সাপ-খেলানো ছন্দে রসাতলের দিকে,
বিদ্যুৎ আর বাজ ধ'রে ধ'রে।
জলে-ঝড়ে মেতেই আছে এরা,
গিরি-অরণ্য সবাই;—
অশেষ মাতনে মেতেই আছে—
কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা;
বসন্তের ক্ষণিক স্বপ্ন
দেখে কি দেখে না এরা নিমেষের মতো।

বরফ-ঢালা উত্তর-বাতাস এ—
ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙানো,
কুয়াশাতে ভারি;
এরি তলায় এ কাচ-মহল্—
ঠুন্কো, ভারি পল্কা,
একেবারেই হাল্কা—
যেন পরীস্তানের ময়ূরপংখী পান্সিটি।—
সায়র-নীল ছায়ার ঘেরে ধরা
বুদ্বুদ্ একটি যেন সাত-রঙা!
পল-তোলা কাচের ঢাকনি-দেওয়া রঙমহল্—
রঙগন ফুলের রেণু-মাখা, কাচপাখনা মৌমাছির
ছেড়ে-যাওয়া মৌচাকটির প্রায়
শূন্য প'ড়ে আছে ভাঙা বাগানে।
এক পলকের নির্মিতি—
চিকন-কারি কাচের ঢালাই শিষ্ মহল,—
চিকন গাঁথ্নি এমন,—
যে আলোর ভারে ভাঙলো বুঝি
মিলিয়ে গেল বা হাওয়ায় হাওয়ায়!

ফুল বাগান কাচমহল ঘিরে,
ভাঙা ফুলদান ঘিরে উজাড় বাগানটা;—

মালাকরের বোনা ফুলের গহনা যেন ছিঁড়ে-পড়া,
এ যেন ধসে-যাওয়া সরু লহর, মিঠে জলের!

মায়াতে ঘেরা বেজান্ সহরের বাগান এখানা,—
খোয়াব্ জাগায় দিক-ভোলানো।
সুন্দর-বুনন্ সুজনীর মতো আর এক বাগান—
মন মাতিয়ে রূপেতে রঙেতে
পৌঁছে যায় চোখের সামনে।
দেখি আর এক দিনের রঙ্‌মহল ঘিরে
খুসির জলুস্ সাত্‌রঙা
দিচ্ছে ঝলক্ ফুল-বাসরে;
মহলে মহলে দিচ্ছে ঝিলিক্—
দেওয়ালে আরসিতে,
কাচের ফুলদানে, স্ফটিক-ঝালর সামাদানে,
মণি-কাটা পেয়ালাতে, সোনাতে রূপোতে মণিমাণিক্যে বিল্লোরে।

হিল্লোল্ দিচ্ছে রঙ—
পহল্‌দার কানের দুলে, মোতির কর্ণফুলে,
কালো চুলে হীরের ঝাপ্‌টায়,
হাতের পঁহুছায়, কণ্ঠমালায়,
নূপুরে গুঞ্জরী-পঞ্চমে, পায়ের তলায় হেনার রঙে
দিচ্ছে ঝলক্, ধ'রচে জলুস জলসার বাতি।

পরীস্তানের খোস্‌বু হাওয়ার
একটুখানি ছোঁয়াচ্ পেয়ে
গুলজার যেন বাগিচা এখনো—
বুল্‌বুলির গানে-গানে, ফুলে-ফুলে গুলেস্তাঁর
সকাল সন্ধ্যায় এখনো মনে হয়
বনের তলায় ব'সে যায় সবুজ দরবার,—
ফুলে ফুলে ফুল-বিছানো মস্‌নদ্ জুড়ে;

ফুলের বাহার লাগে রোজই—
ফুলদানির ফুলের, তোর্‌রা বাঁধা ফুলের,
হিমে ফুটন্ত গোলাপফুলের।

বুল্‌বুলের মন-লোভানো মালঞ্চে এইখানে
সময়ে অসময়ে বসন্তের স্বপ্ন দিয়ে বয় যেন
গুলরুঃ বাতাস পরীস্তানের;
হঠাৎ খোলে যেন দক্ষিণ-দুয়ার শীতের রাত্রে,
ফুলবোনা কিংখাবের পর্দার ভাঁজ সরিয়ে
এসে পৌঁছোয় বাতাস—
সোনার পিঁজ্‌রাতে মাণিকে-গড়া খেলনা বুল্‌বুলির কাছে।
—পরীস্তানের বুল্‌বুল্‌ সে
ঘুম জানে না, নেচেই চলে;
বলে অবিরত—পিও পিও পিও!



দেখি ফোয়ারা উঠছে গোলাপবাগে—
উঠছে প'ড়ছে তালে তালে,—
মণিমঞ্জীরের ছন্দ ধ'রেঃ
উল্‌সে উঠছে গোলাপ-জল ফুহারি দিয়ে,
ঝরনা বইছে উপবনে—
আবীরে চন্দনে মদে আর মেহ্‌ন্দিতে রাঙানো।

সন্ধ্যাতারার আলো-ছোঁয়ানো সাহানা সুরে
বেজেই চ'লেছে সারঙ্গী;—
সুরে সুরে আল্‌সে-ঢোলে
বিভোল ছন্দে চ'লেছে
রাগ-রাগিনী—গলাগলি সাঁঝি আর ভোরাই;—
আসছে যাচ্ছে ভোরের নেশায় ভরপুর!
নর্তকীর নূপুরের জিঞ্জীর-পরানো
স্বর্ণমৃগী তারা যেন—
ঘুরছে ফিরছে বিহ্বল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি;
ভেবেই পায় না রঙ্‌মহলে হ'ল রাত্রি শেষ,
না হচ্ছে রাত্রির আরম্ভ!

সকাল সন্ধ্যার ভ্রম জাগিয়ে
চমক্‌ ধরে কাচ-কাফুনের ঠুনকো দেওয়াল;
আগুন-হানা রোদে, হিম-ছোঁয়ানো চাঁদনীতে
দেখা দেয় একই সঙ্গে—
সেদিনের ও রঙ্‌মহল,—
ভাঙা বাগান এদিনের-ও!

কাঁটায় কাঁটায় কাঁটা ফুলে ভর্তি
মালঞ্চ এখন শুকিয়ে-যাওয়া;
এখানে ওখানে দেখছি শুধুই
মালঞ্চের মালিকের মতলবটাই;—
শেওলা-সবুজ সানে-বাঁধানো চৌরাস্তা—
একটু দেখা যায় এখনো;
একটি ধারে পাতা ঝরানো পারিজাত—
আছে উদয়-অস্ত আবোর-ঘেরা একলাটি;
শ্বেত পাথরের আতসঘাড়—
ফাট-ধরা তার চক্রটা—
আঙ্গুরী-সরাপের ছোপ লাগানো;

পাথরে-গাঁথা নক্‌সা-কাটা চবুতরা—
জাল দিয়ে ঘেরা—
হেলে প'ড়েছে অতল একটা ভাঙনের বুকে
রোদ হেলে এদিকটায় এ-বেলা ও-বেলা;
চাঁদ ঝলে এ-পহর ও-পহর।

সাতরঙা আগুনের রূপটানে মাজা
চিকন কাচের পর্দাখানি,
তারি ও-পারে রঙ্‌মহলের অন্দর;—
আঙুর লতায় আড়াল-করা ছোট্ট মহল—
সুন্দর ছোট আপনি-ফোটা বনফুলটি;
বাতাস-ঢালা বে-দাগ কাচের ঝারি একটি—
নিরালাতে ঝাউতলায় ঝিক্‌মিক্‌ করে।

হেনার বেড়ায় আগলে-রাখা খিড়কি,
তারি মাঝে ভাঙা ফোয়ারা,—
মোতিয়া-ফুলের পাপড়ি-মেলানো ছোট্ট ফোয়ারা—
মকরি-সাদা বিল্লোরে ঝল্‌মল্‌—
শিশিরের ভারে নুয়ে-পড়া ফুলই যেন পরীস্তানের!

গোলাপ-জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে
খেলাই ছিল এই ফোয়ারার,
শিলের ঘায়ে, কি শিশিরের ভারে, না সে রোদের স্পর্শে
ফেটে হয়েছে চুরমার—
ঝড়ে পড়েছে ভেঙে!

রূপের ঝিক্‌মিক্‌ ফোয়ারার—
ধুলোতে কাঁকরে আজও রয়েছে ছিটোনো—
ঘাসের উপর শিল-গালানো শিশিরবিন্দু—বিন্দু বিন্দু!

কাঁটাবনে লুটিয়ে-পড়া ফোয়ারার
অবশেষটুকু, জড়িয়ে জড়িয়ে শত-পাকে,
পড়ে আছে—
নীল-ডোরা সোনালি কাচের সাপিনীটা—
ফোয়ারার তলাকার মন্ত্রে মুগ্ধ যেন।

বাগানের এই কোণে একটি ঝরনা—
নেচে চলেছে, বলছে কথা কতই!
আলো-ছায়ার মায়া দিয়ে ঘেরা এই কোণে বাগানের
উড়ে এসেছে ভ্রমর একটা,
পেয়েছে হয় তো মধুর সন্ধান এইখানেই;
পাহাড়ি ঘাসের সোনালি দোলায়
দুলছে আনমনে ছোট্ট একটা প্রজাপতি,—
হালকা দুটি পাখনা তা'র—
কাচ্‌মহলের খিল্‌-খসা ঝরোকার মতো
খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে আপনা আপনি!

ফুল-বাগিচার রঙ্‌মহলের কাফুনটা থেকে
ছাড়া-পাওয়া স্বপ্ন
রঙে-রঙে ঢেউ খেলিয়ে অস্ত যাচ্ছে এই দিকটাতে;
এইখানটায় বাসা বেঁধেছে
বনবাসী শাহ্‌ বুল্‌বুল্‌,—
পারদ-সাদা পাখনা তা'র,
নিশা-কালো দু'টি চোখ!
ভাঙা-বাগানের প্রাণপাখী সে—
করছেই উহুঃ উহুঃ উহুঃ!

নিবাসিন্দা দেশের মানুষ—
কে সে বে-খবরী একজন,
নিয়ে এল ডেকে দলে-দলে
খামখেয়ালি উল্লাসীর দল;

পাহাড়ে এসে বাসা বাঁধলো তারা—
কাচে-ঘেরা,
ফুলঝারির ফুল কাটা ফুল্‌কি-লাগানো
কাচের বাসা,—
ফুল ফোটানো ফুল ঝরানো ফুলবাগানে,—
ভ্রমর আর বুল্‌বুলির মনোমত উপবনে
বসিয়ে দিলে রঙের মেলা খেলাচ্ছলে!
ক্ষণিক রঙের রঙ্গী কেই বা সে?
উল্লাসীর দল কে বা তারা
ক্ষণিকের উল্লাসে-বিলাসে
বেপরোয়া খেলে গেছে—
উদয়-অস্ত আকাশের তীরে বনে-পাহাড়ে!
মেঘে-বাসা-বাঁধা বিদ্যুতের খেলা খেলে গেছে,—
হাউইয়ের হল্‌কা-লাগা সাত তারার খেলা—
খেলেই মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে!

গঙ্গাজলী-ঘন কুয়াশাতে
তলিয়ে যায় থেকে থেকে ভাঙা বাগান;—
বোঝাই যায় না কোথায় গেল,
আছে না আছে মহলঘেরা ফুলবাগান;
জানাই যায় না কোথায় শেষ কোথায় বা আরম্ভ
ঠুন্‌কো এই বুদ্‌বুদ্‌টির!
ফটকের বাইরে এসে পড়ি—
দিনের আলোতে চশ্‌মা-চোখে
দেখি লিখন—"শিষ্‌মহল টু লেট্‌!"
এখানে ভুটিয়া-মালী ফুলের চান্‌কায় ক্ষেত দিচ্ছে—
শাক-সব্‌জি তরি-তরকারির ক্ষেতই খুঁড়ছে মালী;
সামনেই রয়েছে তারও কাফুন্‌টা ধরা—
মস্ত একটা তালাবন্ধ কাচ্‌মহল্‌—
শেওলাতে সবুজ!

তিন-দরিয়া

ধাব্‌লা পাহাড়ের ঠিক নীচেই
কাঁতি-কালো করাতি পাহাড়,
তারও নীচে তিনমুখে তিনটে চূড়ো—
—মনিয়া-পাহাড়, তুঁতিয়া-পাহাড়, সুর্মি-পাহাড়—
—লাল সবুজ নীল,
রঙ ফেরায় ওরা সকালে বৈকালে দুপুরে।

তিন পাহাড়ের অনেক নীচে,—
ভাঙনের ধারেই, টংসুং বস্তি,
বস্তি পাহাড়ের অনেক উপরে,—
মশানের কাছেই শালবন,—
—চিতার ধুঁয়াতে ঝাপ্‌সা দিনরাতই—
টংসুং লামার গুম্ফা উঠছে সেখানে।



কথা দিয়েছে বস্তির মেয়েরা
—পাথর তুলে দেবে জনে জনে তিনশো যাট,
সুরু করেছে সবাই পাথর বহার শক্ত কাজ।

নীচে থেকে উপর পাহাড় অনেকটা পথ,
সেখানে উঠে যায় মেয়েরা রোজই,—
ভারি ভারি পাথর ব'য়ে,
—দেওয়ালের পাথর, দেউলের পাথর
ব'য়ে চলে একে একে,
পিঠে ভার যায় মেয়েরা—
সারি সারি পিপীলিকা যেন।
চড়াই-পথ বিষম সরু,—
ঠেকেছে গিয়ে মেঘের গোড়ায়,
—কুন্‌রী-ঝোপের টাটকা সবুজে আড়াল-করা হাঁটাপথ—
বেগানা পথটা গড়ানে পিছল,
খোঁচা খোঁচা পাথর বিছানো,—
চ'লে গেছে মশান ছাড়িয়ে
কত যে উপরে ঠিক নেই;
মরা ঝরনা কেটে গেছে পথটা কতকাল হ'ল,—
থেকে থেকে ঝাঁপে পথ রঙ-কুয়াসা,
রোদ প'ড়ে থেকে থেকে এ পথে,—
পায়ের তলায় পাথর ক'খানা
আগুন হ'য়ে ওঠে।
কতদিন ধ'রে চ'লেছে এ পথে কত না মেয়ে,—
পাথরের বোঝা নামিয়ে দিয়েছে মশানের ধারেই
সে কত বার তা'র হিসেব নেই।

ব্রতচারিণী বস্তির মেয়েরা,—
ছোটোবড়ো সবাই করছে কঠোর,—
শোধায় না কেউ পূর্ণ হবে ব্রত কতদিনে,
কথাটি নেই, হাসি হাসি মুখ
ক'রে চলেছে কাজ সমাধা টংসুং গুম্ফার,
আনন্দ পায় এরা ভারি বোঝা ব'য়ে,—
কুয়াশার উপরে উপরে চলে চলায়,

এরা জানে মশান ছাড়িয়ে উপর বনেতে,
পিয়াশালের নিবিড় ছায়ায়
উঠবে একদিন অটুট গুম্ফা,—
টংসুং বস্তির কামনা-জড়ানো পাথরে পাথরে
আকাশের খুব কাছাকাছি।
বস্তি ছেড়ে একটু তফাতে,
পাইনিয়া বনের ধারেই
দেখা যায় ভিখ্‌-ঝরনা নেমে এসেছে,—
সে যেন তিন পাহাড়ের আশীর্বাদ
ঝ'রছে দিনরাত ধারা দিয়ে ত্রিধারায়।

এইখানটিতে দিনরাতই
রৌদ্র-ছায়াতে লতায়-পাতায়,—
মনের কথা চালাচালি করে,
ঝরনার জলে অচল পাথরে
কথা হয় যেন কত কি!
তল্লাটের মেয়েরা আসে,
দূর দূর থেকে এইখানে,
মান্‌সিক দিতে ঝরনা-তলায়,
মান্‌সা-পুজোর ডালা ব'য়ে
অপরাহ্নে রোজই আসে
মেয়ে কয়টি একা-দোকা।

ভিখ্‌-ঝরনার উপরে নীচে, অরণ্যে পাহাড়ে
আছেন দেবতা একলাটি,
ঝরনার বুকে জমা-করা পাষাণ
সেখানে আছেন তিনি চিরদিনই,—
—দাঁড়িয়ে আছেনই সাদা কালো শিল-পাটে পা রেখে—
মানস জানাতে তিনি, মনখানি জানতেও তিনি।

তিনি বনের দেবতা,—
        বসেন সকালের ফুলে, সন্ধ্যার ফুলে, রাতের ফুলে;
তিনি জলের দেবতা,—
        আছেন ঝরনায়, আছেন নদীতে, আছেন সাগরেও;
জন্মমাটির দেবতা তিনি,—
        জাগেন স্রোতে-ঘেরা পাথরে,
        ঘুমান পদ্মবনের গোড়াতে একলা,
—পক্ষে পক্ষে পুজো নেন তিনি বস্তির মেয়ের।



মন জানিয়ে কত কি লেখা নতুন নিশান,—
        এপার গাছের নতুন পাতায়,
        ওপার গাছের ফুলের ডালে,—
                জল ঝ'রে মাঝে পাথরে পাথরে।
এইখানে দেয় মান্‌সিক বস্তির মেয়েরা,—
—ধরে বেজোড় ফুল, নতুন পুতুল পিটুলির, বাতিধূপের—
    মানস জানিয়ে পুজা করে মনে মনে,—
    ফেরে যে যার বস্তিতে একা-দোকা,
    জ্বলতে থাকে ঝরনা-তলায় মান্‌সা-পিদুম—
            একটি, দুটি, তিনটি।
বাতাসের মুখেই ধরা
        মনের-কথা-জানানো বাতি,—
        যত্নে-তোলা বেজোড় ফুল,—
        পল্‌কা পিটুলির খেলার পুতুল,—
কত নেভে, কত থাকে জ্বলে,—
        কত ভেসে যায়, কত বা শুখায়,—

কত ভেঙে পড়ে, কত পায় ক্ষয়,—
সংখ্যা নেই তার!

সাঁজ-সেজুতির বেলাশেষে
যখন হিম হ'ল রোদ,—
ঘুমিয়ে গেল মোনাল্ পাখি সোনালি রুপালি,
—আলসে-হেলা পলাশ ডালে
যেন সে ফুলটি জোড়-ভাঙা,—
সন্ধ্যাতারা এল চুপে চুপে,—
পুজার বেলায় মানস-পিদুম্
নামিয়ে রাখলে বনের ধারেই,—
নিরিবিলি এ-সময় ভিখ্-ঝরনাতে
মেয়েদের দেওয়া মানসা পিদুম্
যে-কথা জানায় মানস-দেবতাকে নিরালা পেয়ে,—
বস্তির মেয়ের মনই জানে তা'র সন্ধান।

আকাশ-ধরা তারার পিদুম্
নিত্য জ্বলে, নিত্য নেভে,
ঝরনায়-দেওয়া মান্সা-বাতি
এই জ্বলে, এই জ্বলে না,—
বস্তির মেয়ের মনের কোণে মান্সা নিত্যই
মনে মনে জ্ব'লে, মনেতে মেলায়—তিনসন্ধ্যা।
রাত্রিমুখে পরাহু-পাখি ডাকাডাকি করে,—
আঁখ্‌লি-ফুলের কাঁটার বেড়ায়;
দিন হয় শেষ রঙে রঙে ঝড় উঠিয়ে,
পাহাড়ে পাহাড়ে চম্‌কায় রঙ,—
পদ্মরাগ নীলকান্ত অয়স্কান্ত,
ইন্দ্রধনুর রঙের টংকার বাজে মেঘে মেঘে,—
ফুটে ওঠে ফুল শিমুল, পলাশ, করবী, কাঞ্চন,—
ঝলক্ দেয় পাতা হরিৎ-পীত, নীল-পীত, নীলারুণ,—

রঙ ফোটায় দিক্ বিদিক
বহুরূপ, বহুরঙ।
চক্‌বাজারে সিনেমা-হাউস
জ্বালে এ সময়ে বিজ্‌লি-বাতি,
চলে সবাই বস্তির মেয়েরা,—
চলন্ত-ছবির তামাসা দেখতে,
রঙ্গিণী সব, রঙীন সাজ,
বড়ো রাস্তায় হেলে দুলে চলে,
—হর্‌দী কম্‌লী শ্যাম্‌লী সুর্‌খী—



ঝিলিমিলি রঙ চম্‌কায় পুঁতির গহনায়,—
ফিরোজী কাঁচের বুকপাটায়,—
ফুলকাটা সাটিনের আঙ্গরাখায়,
সোনার হারে, গালার চুড়ি মখমলে কম্বলে;
নতুন ক'রে সেজেছে সবাই,
রুখু চুলে বেণী দুলিয়ে চ'লেছে পান খেয়ে;—
থিয়েটারে-শেখা বাংলা গান মুখে মুখে সবারই,
—নয়নবাণ ভুরুধনুর খিচুড়ি পাকানো গান—
সিনেমা-হাউসের সাইনবোর্ডের কাছেই,—

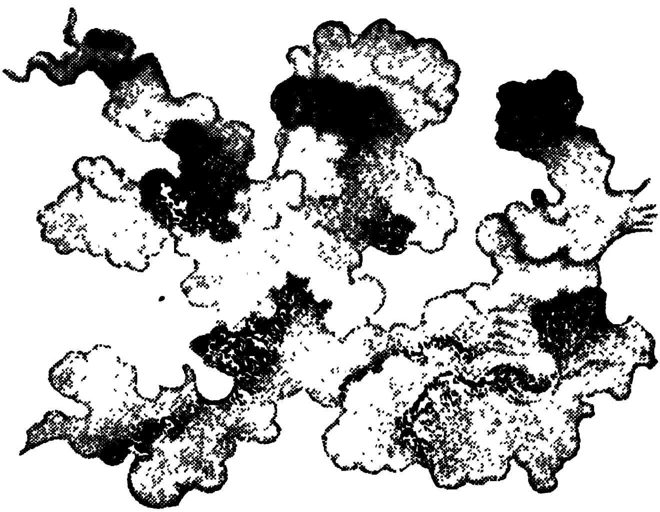
আধা-পরিষ্কার আধা-ঘোলাটে বিজ্‌লি-বাতির
    ফানুস ঘিরে পতঙ্গ যেন ঘোরেফেরে সবাই,
সাপের মতো কুণ্ডলি-পাকানো,—
    জ্বলন্ত তার বিজুলিটা,—
    আলোর ধাঁধা দিয়ে চায় অন্ধকারে;
লামার পাহাড়, ভিখ-ঝরনা
    দেখে না আর বস্তির মেয়েরা—
                মনের কোণেও!

    তিন পাহাড়ের তিন্‌টে রঙ নেভে আস্তে এ সময়ে,—
ওঠে চাঁদ টোল্‌-খাওয়া গোল,
—ত্রিশির ভৈরবের মস্ত চোখটা চেয়ে দেখে যেন;—
টুংসু লামার পাথারের স্তূপটা মশানের ধারেই
দেখায় আকাশের গায়ে কালি দিয়ে টানা;
অন্ধকারে সবার উপরে ফুটে ওঠে ধব্‌লাগিরি
    --শিলী-সাদা, ফেনী-সাদা, ধুতুরী-সাদা।

দুপুর রাতে বিজ্‌লি-বাতি
    সিনেমা হাউসে নেভে দপ্‌ করে,--
        ঘরে ফেরে বস্তির মেয়েরা,—
চাঁদের আলো ঠাণ্ডা লাগে চোখ,
    দোকান-পাট বন্ধ এখন,
    কাফিখানা ফেলেছে ঝাঁপ,
রাস্তায় পড়েছে ঘরের ছাওয়া সুর্মি-কালো—
        একটা, দুটো, তিনটে।

মায়ুরী-নীল বনস্থলীর,
ও সেই কুহেলি-কুহর পাহাড়তলার মেঘ;—
পারাবত পায়রা যেন দুই রঙা
দুই দল এরা,—
বসে ওরা এপারে ওপারে ঝরনার,
রোদ ঝিল্‌মিল্‌ উত্তর হাওয়ায় ডানা মেলে।

বাসিন্দা-মেঘ কস্তুরী-কালো ভারি-ডানা,
নিবাসিন্দা-মেঘ ধুতুরা-সাদা লোটানো-পাখ্‌না।



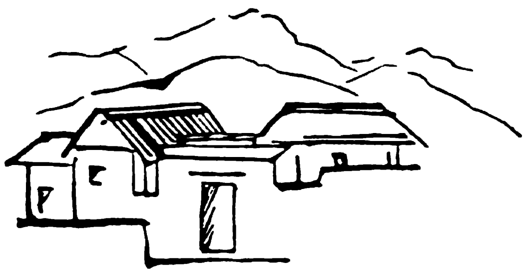
শীতের বেলার নতুন পাখি—
জলভরা-মেঘ জলহারা-মেঘ,—
ঝিলিক্‌-দেওয়া পাখনা মেলিয়ে ঘোরে ফেরে,
বাতাসে-লোটানো ডানা হেলিয়ে ওঠে নামে;

শূন্যে তোলে ঘূর্ণা,
আলো-ছায়ায় ঝিলিমিলি হিল্লোল জাগায়।
মেঘে মেঘে যেন পাখনার শিহরণ
ফুহরি ফুহরি ওঠে,
ফুহরি দ্রুত-বিদ্রুত বাজে পাখনা ঝরঝরি;
—দূরে কাছে ঘুরে ফিরে
বাতাসে হেলে পাখা নীল আর শাদা।

মেঘ ওরা পারাবত পায়রা ওড়ে,
ঘোরে ফেরে খেলে খেলা সারাদিনই,
—আকাশে লোটায় বাতাসে লোটায়
লোটায় পাথরে,
—ঝরনার স্রোতে ধরে ছায়া আর ছায়া;
—কায়া আর ছায়া পাশাপাশি
ক্ষণে ক্ষণে আসে যায়।
নিমেষে কাটে রোদের বেলা,
নেমে আসে মেঘ,—
খেলাশেষে ঘর-ভোলা পাখি যেন
খুঁজে খুঁজে চলে
অন্ধকারের পারের বাসা;
শীতের রাতে সেখানে ঝাঁপে ডানা
—দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে মেঘ
ঝামর কুহর স্তব্ধ আকাশে ভাসে
চাঁদনী-ছোঁয়ানো ঘুমে অলস।

হাটবার

লক্ষ্মীবারের হাট—
খড় আর বাঁশ আর জ্বালানি কাঠ নিয়ে,
ঠাকুর জমিদারের কোঠাবাড়ির ফুল-বাগান—
তারি সামনেই খোলা জমিটা বাজার-ঘেঁষা;
লেগেছে হাট সেখানে ধুমধামে
পুণ্যের দিনে।
কচুরি পানায় ঢাকা খালের জল,—
তারি ধারে বুড়ো বুড়ো গাছ সব
চারিদিক ঘিরে সবুজের কানাত টেনে দাঁড়িয়ে,
চুপ করে হট্টগোলটা পাহারা দিচ্ছে কেবলি!
লম্বা লম্বা বাঁশ চিৎ হয়ে ঘুম দিচ্ছে
বিকোতে এসে সারি সারি খোলা মাঠে পড়ে:
বাজারের ধারে গোলা ঘর ক-টা।



টিনের ছাতগুলো তাদের দেখতে হয়েছে ঠিক যেন
বাদলা দিনের আকাশ এক-এক খণ্ড।
আর গাছের উপর ধোঁয়াটে আকাশ-
তাকে লাগছে রাংতার চাদর যেন এক ফর্দি!
সরু খালের ঘোলা জল কেটে

আসছে নৌকো সারি সারি দাঁড় ফেলে—
        জলের বাটে লাগিয়েছে যেন ঘোড়দৌড়,—
ঘাটে এসে বোঝা নামানোর হার-জিত খেলা;
    খেলে চলেছে নৌকা, মাঝিমাল্লা সবাই ওরা।
জমিদারের বড় বজ্‌রা—
সে বোঝা বয় না হাটের, দৌড়েও চলে না কোনোদিন,
ঘাট জুড়ে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে,
    খুব খানিক রং-চং মেখে নিয়ে গায়ে
    চল্‌তি নৌকাগুলোকে দেখে বজ্‌রা গম্ভীর ভাবে!
পুরোনো ঝাউগাছটা ঘাটের ধারেই একলা দাঁড়িয়ে
জমিদারের বড় বজ্‌রার মাথায় ছাতা ধরে
    রোদ আগ্‌লাতে, বৃষ্টি ঠেকাতে ব্যস্ত ভাব দেখায়
    আর সে কেবলি বলে 'সর্‌ সর্‌'।
রোগা রোগা চল্‌তি নৌকোর ভিড়,
        তারই মাঝে পেটমোটা পিনেস্‌খানা
    মনে হচ্ছে এ যেন চল্‌তি ভাষার মাঝে
        মস্ত একটা সমস্‌কৃত সমাস—
    যার মানে পাওয়া যাচ্ছে না একেবারেই।

আতস বাজি

ধুমে ধামে বাজি পোড়ান মহারাজা,
অবেলাতে বোমা দোদমা দেদার ফাটে
—শব্দ দেয় ধুঁয়া ছাড়ে অনবরত;—
চম্‌কি বাজি সে ধুঁয়ার উপরে
        থেকে থেকে ঝিলিক্‌ টানে
—মনে হয় বর্ষাকাল এসে গেল
        দিন ভুলে দিগ্‌বিজয়ে;
—শুনি অসময়ে ডাকে যেন মেঘ—
ক্রীড়া-কাননে হরিণ-শিশু ডরিয়ে ওঠে,
—চম্‌কায় শব্দে চকিত চোখে চায়,
পদ্মবনের কিনারা থেকে
        সারস পাখি দেখে ঘাড় তুলে
—আকাশের এপার ওপার ঘন অন্ধকার!
বাজির ধুঁয়া দম বন্ধ করে সন্ধ্যা বাতাসের,
রাজবাড়ির সিংদরোজায় রাজহস্তী
        দুই কানে কুলো চালে কেবলি!

                রাজদরবারে মহারাজা স্বয়ং
                        মুঠো মুঠো ফাটান ভুঁই-পটোকা
                রাজপুরোহিত ছাড়েন হাউই,—
                        ধ্রুবলোক লক্ষ্য করে সোজা বাঁকা,
                রাজকবি জ্বালান তুবড়ি শতে শতে,—
                        ফুলকাটা নিজের রচনা,
                রাজশ্যালক ছাড়ে ছুঁচোবাজি অগণ্য,—
নগরপালের খোড়ো চাল তাগ্‌ করে!
        পাঠশালার আঙিনাতে
                সুয়োরাণীর ছেলেটা

—খেলে চরকি বাজি গুরুর সঙ্গে,
গুরু বলেন শিষ্যকে,—
চরকি চমৎকার ঘুরবে তোমার
সারা ভূমণ্ডল উদয় অস্ত;
পোড়োরা করে কানাকানি,—
জাঁতা-ঘোরানোর ভঙ্গী দিয়ে জানায়,—
কুমারের চরকি গণ্ডির বাইরে যাবেই না
হবে হঠাৎ কুপোকাৎ
খানিক আগুন ছিটিয়ে।

রানী-মহলে সুয়োরাণী
দেখেন তারাবাজি ছাতে উঠে,—
শতে শতে পুরাঙ্গনা তারা
ঝরায় ফুলঝরি রানীকে ঘিরে;
কন্ রানী রাজার সাঙ্গাৎনীকে—
বলি সই দুয়োরাণীর ঘরের কাছে
ফুঁসলে উঠছে ওই যেগুলো,—
অগ্নিবাণ কি ওকেই বলে?
সই বলে—
বাণ হলে চলত সোজা
এ যে আগুনের সাপ গো
চলেছে বাঁকা পথ ধরে;
রানী বলেন—
সাপ যদি হবে তো মাণিক কোথায়?
সই বলে—
মাণিক গেছে চুরি,—
হাতড়ায় তাই অন্ধকার,—
চলতে চায় সাত তারার দেশে,—
চুরি করতে সাত রাজার মাণিকটি।
রানী মহলের আর এক ধারে,—

রাজার বৌ আর রাজার মেয়ে
মণিমন্দিরের ঝরোকা খুলে দেখতে পায়,
—উপবনে নাচন-ময়ূর
বাজির শব্দে চমকে উঠেই
মুখ ফিরিয়ে ঝিমোতে থাকে
ঝুঁটি নামিয়ে!

কন্যা বলে,—
লাগল ঘনঘটা সন্ধ্যাকাশে
ডাকে মেঘ চমকায় বিদ্যুৎ
—নাচন-ময়ূর পাখনা মেলে না তবুও
এ কেমন হল!

বৌরানী বলে,—
ও যে ভাই শিখী
সত্যি মেঘকে চিনতে শিখেছে
এই সে দিনে আষাঢ় মাসে!

রাজকুমারী বলে—
বৌরাণী, আকাশ হল কাজল বরণ
দীঘির জলে ফেলল আলো মেঘলা-করা,—
কঙ্কপাখি জলের ধারে
বসেই রইল অধোমুখ,
কলহংস সেও থাকল চুপ,—
এপার-ওপার কমলবন
মুখর হল না ধ্বনিতে ওদের
দীর্ঘিকা আজ শূন্য ঠেকে?

রাজবধূ বলে,—
এপারে-ওপারে দুজনে ওরা জলচেনা পাখি,—

গেল বাদলে পদ্মপত্রে জলের লিখন
দেখেছে ওরা তাই আছে চুপ আজকে,
প্রাণে ওদের সুর জাগে না বাজির ঘটায়!

কন্যা বলে,—
মধুবনেতে মালি মালিনী
ফুলঝুরি ঝরায় মালঞ্চ আলো,—
মধুকর মধুকরী চলে না সন্ধানে,
—জোনাকি বারবার ইসারা পাঠায় ওদের—
মধু আনতে নেই তাড়া মৌমাছির!

বৌরাণী বলে,—
আগুনের ফুলকির পাশেই যে মাধবীলতা
তারি সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে মনটি ওদের দখিন হাওয়া
গোপনে সেই সে গত মধুমাসে!

কন্যা বলে,—
সোনার খাঁচাতে কইচে শুনি যে শুকসারিকা
কাজরী গানের প্রথম ছত্র?

বধূ বলে,—
খাঁচাতে ধরা চিরকালই
—মেঘ দেখেনি বাদলে ভেজেনি—
শুধু মুখের কথা পড়তে শিখেছে—
ভুলে বসে আছে কাজল মেঘের আসল বর্ণ!

কন্যা বলে,—
সোনার শিকলে বাঁধা তো হরিণ;
ও কেন তবে হয়েছে চঞ্চল
রংমশালের রঙেতে রঙীন দিক্‌প্রান্তে
চাইছে উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব!

রাজবধূ বলে,—
না না, সে অনেক দূরে—
বাঁশি বাজে কোথায় শুনছে ও,—
রংমশালের রঙীন মরীচিকার ওপার খুঁজছে
কালো চোখ দুটি বারে বারে।

গাঁয়ের মেয়ে দুয়োরাণী সে
থাকে কুটিরে বসে একা উদাস মনে,
দেখে গৃহ-পারাবত মেলায় ডানা ঝাঁকে ঝাঁক,—
রংমশালের আলোর দিকে উড়ে চলে যায়,
আনমনে কান পেতে শোনে দুয়োরাণী
—অনেক দূরে চাতক বলছে
রঙিন এ মেঘে আগুনই ঝরায়
জল বর্ষায় না কোনোদিন!

এ কা'র জন্য ?

শোভাময় চন্দ্রোদয়ের দিকে চাই
ভাবি—এ শোভা কা'র জন্য
আলোময় প্রভাতের আকাশের দিকে চাই
ভাবি--এ আলো কা'র জন্য
কা'র জন্য বর্ষার এ ঘনচ্ছবি
কা'র জন্য অপরাজিতা ফুলের এ নীল
পাতার লতার এ সবুজ
পাকা ফলের এ সুবর্ণচ্ছবি
বোঝাতে তো কেউ নেই পাশে, কেউ নেই কাছে
মন থাকে স্তব্ধ এ রহস্যের সামনে: থাকে নিরুত্তর
অন্ত খুঁজে পায় না—তল খুঁজে পায় না—!
কার কাছে যাব জানতে—
আমার মনের অগোচর দেশ থেকে কে পাঠাচ্ছে এ-সব,
কার জন্যে ? সেই কোন্ কাল থেকে আজ পর্যন্ত অফুরন্ত
এইসব এত সব !!!
এ কা'র জন্য ? কে বলে দেয়।



অন্যান্য রচনা

ছবি ও সুর

বেলা তখন পড়ে আসছে। দুধারে মানুষ-ভোর মেহেদির বেড়া—তারি মাঝ দিয়ে সরু রাস্তা সোজা গিয়ে মাঠে পড়েছে। সামনেই একখানা তেঁতুল আর শাল আর মহুয়া গাছের সবুজ-ঢাকা কোল্-বস্তি, খড়ের ঘর, নিবিড় ছায়া আর সূর্যাস্তের আবির দিয়ে রচা একটি রূপকথা! কিন্তু মন টানলো আজ তেপান্তর মাঠের পারে খোলায় আর আলোয় আর বাতাসে ঘেরা কত কালের ভেঙে-পড়া খোলার ঘরে। দুটো মাঠ পেরিয়ে সেখানে এসে সন্ধ্যা হল, তখন জগন্নাথপুরের পাহাড়ের ওপারে সূর্য ডুবছে। ঘরখানার মধ্যে সুন্-সান্ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝে কয়েকটা হারিয়ে-যাওয়া জানলার ফাঁক, তারি মধ্য দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে—সোনার পটে কালি দিয়ে লেখা দু-তিন খানা ছবি—কালো চৌকাঠের ফর্মা-বাঁধা একটু একটু ছবির আভাস। চলাচলের পথ ভাঙা ঘরকে যেন পাশ-কাটিয়ে বেঁকে চলে গেছে—গ্রাম ঘুরে পাহাড়ের দিকে। খোলার ঘরে আসবার পথ কতক হারিয়ে গেছে ধুলোয় আর চোর-কাঁটায়, কতক জেগে আছে এখান-ওখানে—একটুক্রো শুক্নো বাগানের মাঝে দুটো বিলিতি ফুলের শুকনো ডালের ছায়া ধরে। ওধারের ছবিতে ধূ-ধূ মাঠ, দূরে দূরে গ্রাম আর সবুজ ক্ষেতের সরু পাড়, এধারে আবার শুকনো নদীর উঁচু পাড় আর খোয়াই, তারি ধারে রাঙা মাটির সরু রাস্তা—একরাশ কালো পাথরের স্তূপে গিয়ে লুকিয়েছে। সে ধারে ঘন নীল বরিয়াতু পাহাড়, উত্তরের হাওয়ায় একঝাড় বাঁশ সেখানে দুলছে। ভাঙা ঘরের দাওয়ায় ছড়ানো এক-একখানি পুরোনো ইটের কালো ছায়াগুলোকে ঠেলতে-ঠেলতে সন্ধ্যার আলো আস্তে-আস্তে চলে গেল। নীল পাহাড়ের শিয়রে চমৎকার ঠাণ্ডা নীলের উপরে একটি তারা দেখা দিলে, তারি নীচে লাল একটি পুটুস ফুল ভাঙা ঘরের জানলা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলে, আকাশের সিঁদুর-আলোয় তার সিঁথি রঙিয়ে দিয়ে গেছে! নীল অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তারি মধ্যে থেকে দুটি সুর শুনতে পাচ্ছি—কচি গলায় একদল কারা বলছে—

'টিপ্ টিপ্', আর এক দল তারা ক্রমাগত বলে চলেছে—থির্ অথির্। আকাশের তারা আর ভাঙা বাগানের ফুলকে ঘিরে রাত্রির শেষ পর্যন্ত খোলা বাতাস এই দুই সুরের ওঠা-পড়ার ঝংকারে ভরপুর শুনছি!

সবুজ বিপদ

গাছের ডালে গত বসন্তের কচি পাতা তারা পেকে বুড়ো হয়ে ঝরি ঝরি ঝরি ঝরি করছে! পানের লতা সবুজ হয়ে শুক্‌নো পাতাকে ঠেস দিয়ে ছড়া কেটে বললে—আমরা সবুজ! বনের টিয়া কোথা ছিল উড়ে এসে আসর জুড়ে বসে বললে—ঠিক তো বটে, আমরা নবীন আর ওরা একেবারে বুড়ো! গাছের তলায় ছিল এতটুক্‌খানি সবুজ ঘাস, সেও মুখ ঘুরিয়ে বললে—রস নেই, সরে পড়াই ভালো, ঝরে পড় না?

শুক্‌নো পাতারা থর থর করে কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, টিয়া পাখিটা বোঁটা সুদ্ধু তাদের পেড়ে ফেললে মাটিতে।

গাছের তলায় নদী, শুক্‌নো পাতারা ভাঁটার জলে ভাসতে ভাসতে উঠল গিয়ে—সবুজ সমুদ্রের ঢেউ বেয়ে ব্রহ্মার কাছে! ব্রহ্মা বললেন—মাটি ছেড়ে এখানে কেন? পাতার দল নালিশ জুড়লে—পানের মতো সবুজ হব, চিরনবীন থাকব, কেউ বললে টিয়াপাখি হব, কেউ বললে দুর্বোঘাস হব, সবুজ হয়ে বেঁচে থাকাই সবার মৎলব।

ব্রহ্মা কলাপাতার ঠোঙায় শুক্‌নো পাতাদের চড়িয়ে বললেন—আচ্ছা, দেখে এসো সবুজদের কার কি হল, এই খবরটা নিয়ে এলেই তোমাদের সবুজ করে দেওয়া যাবে।

শুক্‌নো পাতারা জোয়ার বেয়ে ফিরে এল পৃথিবীতে। নদীর ঘাটে এসে দেখে বারুই পানের পাতা কেটে চাঙারি বোঝাই করে চলেছেন হাটে বেচতে পান। বেদে জালে ধরেছেন টিয়াকে, সে একটা খাঁচায় বসে হরেকৃষ্ণ পড়ছে, সবুজ বুলি আর ফুটচে না—পাকা কলার দিকে ঠোঁট বাড়াচ্ছে, থেকে থেকে গাছের তলায় একটা পোষা ছাগল কচি ঘাসের মাথাগুলো মুড়িয়ে খাচ্ছে, বৈশাখের রোদ মাঠের সবুজকে পুড়িয়ে লাল করে ছেড়ে দিয়েছে! ভয়ে শুক্‌নো পাতাদের মুখ শুকিয়ে উঠল, বাতাসের বেগে ওঠে তো পড়ে মাঠ ভেঙে দৌড় দিলে—ব্রহ্মাকে খবর দিতে যেতে কারো আর সাহস হল না—পাছে সবুজ হয়ে বিপদে পড়ে ঘাসের মতো পানের মতো টিয়াপাখির মতো।

দীপালি

রাত কেটে আলো এল;—সকালের আলো, আকাশ-বাতাসের দুঃখহরা আলো। ফুলের ডালে বসে বিহঙ্গমা একবার ডেকে থামল—প্রিয়! গাছের তলায় ময়ূর ছিল, সে বললে—ওই সে—বিদ্যুল্লতা ঝিলিক্ দিয়ে চেয়ে গেল! মধুকর গুন্ গুন্ করে বললে—আমার যে প্রিয়, সে ওই ফুলের বনে লুকিয়ে আছে। হরিণ বললে—সে যে কাজল-টানা কালো দুটি চোখ নিয়ে চেয়ে আছে ঐঃ—!

জলে-স্থলে সবাই বলাবলি করতে লাগল—যে যাকে ভালোবাসে তার কথা।

পতঙ্গিকা উড়ে এল;—রাতের অন্ধকারের মতো নীল তার পাখ্না। সঙ্গে এল তার ফুলের পাপড়ির মতো, কচি পাতার মতো হাল্কা ডানা, রঙীন্ সব পতঙ্গ। তারা সবাই যেন কাকে খুঁজে-খুঁজে চলে—কিন্তু পায় না; চুপ করে এসে বসে ফুলের ডালে. আবার উড়ে চলে—খুঁজে-খুঁজে! ময়ূর এদের দেখে নিজের পাখ্না নেড়ে ডেকে বলে—প্রিয়া কইরে! আর সবাই উত্তর দেয়—এই যে! পতঙ্গিকা, সে কেবল সাড়া দেয় না কারু ডাকে; উড়ে-উড়ে খুঁজে চলে দিকে দিকে একা একা।

গহন বনের ধারে সন্ধ্যা নামে, দিন ফুরোয়। সাঁঝের তারা. সে পতঙ্গিকাকে দেখে—চুপ ক'রে আগুন-মাখা আকাশের শেষে চোখ রেখে, যেন কার ধ্যানে রয়েছে! মেঘের আড়ে চাঁদ উঁকি দিয়ে ইসারা করে বলে—দেখা কি পেলে? পতঙ্গিকা উত্তর দেয় না. নিশ্চল হয়ে বসে থাকে—নিমেষ-হারা চোখের পাতা দুখানির মত স্থির অচঞ্চল পাখ্না মেলে। ফুলের ডাল দুলিয়ে রাতের বাতাস ডাক দেয়—প্রিয় প্রিয়, কোথায় প্রিয়! পতঙ্গিকা শুধু একটিবার ডানা কাঁপিয়ে জানিয়ে দেয়—আছে আছে! তারপর সে ধুলোর উপরে নেমে বসে—সঙ্গীহীন!

বন ঘুমিয়ে আছে; অন্ধকারের মধ্যে কেউ আর কাউকে খুঁজে চলছে না, পিয়া বলে কেউ ডাকছে না। নিকষ-কালো অন্ধকারের

বুকে সাঁঝের বাতি দূরে জ্বল্‌লো; সেখান থেকে আলোর হাতছানি দিয়ে সে ডাক দিলে আপন প্রিয়াকে! কালো ডানায় বাতাস কেটে চলে গেল পতঙ্গিকা দীপশিখার দিকে, হাজার-হাজার পতঙ্গ তার সঙ্গ নিলে। নিঃশব্দ দুই পাখ্‌না মেলে চলল তারা চারিদিক থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে, যাকে তারা ভালোবাসে, তার দিকে—আর ফিরল না!

বিহঙ্গমা বনের শিয়রে বসে সারারাত ডেকেই চলল—পিয় পিয়!

ঘুমতী নদী

প্রাচীনা গোমতীর নতুন নাম দিচ্ছি 'ঘুমতী নদী'। আমি আমার প্রেয়সী 'ঘুমতী'কে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, ঘুমোতে যাবার আগে দেখেছি, সকাল-সন্ধ্যা আমি তাকে শুধিয়েছি—সে কাকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে। 'ঘুমতী' আমাকে তার মনের কথা বলেছে—সে চাচ্ছে তার বাদশা বেগমকে। শাহিমহলের সুন্দরী পরিচারিকা—সে সকাল-সন্ধ্যা অপরূপ সাজে সেজে 'মোতিমহলের' ধারটিতে এসে দাঁড়াত—আমি তখন ঘাটে বসে—আমাকে সে শুধোত, ''এসেছেন তাঁরা'' আমি বলতেম—''কই না তো?'' প্রাতঃসন্ধ্যায় কোনোদিন সোনার ওড়না টেনে, সায়ংসন্ধ্যায় কখনো বা নীল বোরখায় আপনাকে আড়াল করে সে চলে যেত। একদিন তখন সন্ধ্যারাগে বারোদোয়ারির টুক্‌রো টুক্‌রো পাথরগুলো হোলির দিনে আবিরে যেন রাঙা হয়ে উঠেছে, নদীর ওপার থেকে অকালে দক্ষিণের হাওয়া বইতে সুরু করেছে, সেই সময় আমি আমার ঘুমতী নদীকে বলেছিলেম—তোর বুকে আমার ছাওয়া কি পড়েনি ঘুমতী? নদী সে স্থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল—দক্ষিণের বাতাস দূরে কোন্‌খানে ধুলোর ধ্বজা উড়িয়ে চলে গেল তার ঠিক নেই, আকাশের রং মুছে গিয়ে নদীর বুকে একটুক্‌রো পাঙাস্‌ আলো উড়ে পড়ল, হঠাৎ সেই আলোর উপর দিয়ে আমি আমাকে ভেসে যেতে দেখেছি—যাত্রিশূন্য একখানি শূন্য তরীর একা মাঝি! ঘুমতী নদী বেয়ে ঘুরে ঘুরে নৌকো চলেছে, নদীতীরে কোথাও বাজছে—উৎসবের সানাই, কোথাও জ্বলছে মজ্‌লিসের বাতি আর কোথাও বা বাদ্‌শার কবর স্তব্ধ-অন্ধকার জলে ফেলেছে আপনার ছায়া। এমনি করে ঘুমতীর বুক বেয়ে আমার ছায়া-মূর্তিকে আমি দেখে এসেছি ভেসে বেড়াতে। ঘুমতীর জল আমার তরীকে ভিজিয়ে দিয়েছে—অত্যন্ত মধুর, অত্যন্ত শীতল স্পর্শে, আমি ঘুমতীকে, তার দুই কূলকে, তার আশে-পাশে যে-কেউ এবং যা-কিছু ছিল সবাইকে আপনার করে পেয়ে এসেছি, ঘুমতী নদীর বাতাস আজও আমার বুকের বাঁশিতে নতুন পুরোনো দুই সুরে বেজে চলেছে।

দোলন চাঁপা

দোলের খবর বনে এসে পেঁছোয় হাওয়ায় হাওয়ায়—বন সবুজ পাতার শুক্‌নো পাতার দোল খেলে চলে। দোলের শেষ নেই বনে গ্রীষ্মে বর্ষায় শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে!

নদীর বুকে দোল বাধে—জোয়ারে ভাঁটায়—এ বেলা দোল ও বেলা দোল, হুলাহুলি দিয়ে দোলনদীর অবিরাম স্রোতে!

অপার দোল সমুদ্রের নীল দোল, দুন্দুভি বাজিয়ে যুগ-যুগান্তর ধরে দোল, কূল-কিনারা হারানো দোল আর দোল!

স্রোতের শেওলা পারের ভেলা—ঢেউ দিয়ে আসে তার দোল। কিবা এ ঘাট, কিবা ও ঘাট, কিবা সে মাঝ-দরিয়া, যথা-তথা পলে-পলে দোল তার।

আকাশে দোল ঝড়ে-বাদলে. মাঠে দোল আলো-আঁধারে সকালে-সন্ধ্যায়. কত বছরে নিমেষের মতো একটি বার দোল লাগে মাটির ঘরে।

ফুলের দোল ক্বচিৎ একটি দিন রাতের বেশি। ফলের দোল ক্বচিৎ দুটো মাস। কচি ছেলের দোল যতক্ষণ সে মায়ের কোলে।

সোনার দাঁড়ে শিকলি বাঁধা টিয়া, তার দোল থেকে থেকে দণ্ডে দশবার ওড়ার স্বপ্নে ভর দিয়ে আসে. দিনে দুপুরে তার দোল।

রসের পেয়ালায় দোল লাগে রসিকের হরদম্‌ সুখে-দুঃখে। বে-রসিকের দোল একদম পাঁজি-পুঁথি ধরে আনাগোনা করে—এ দেউড়ি সে দেউড়ি।

ঋতুগণ—তাঁরা মঙ্গলের জন্যই। আসা যাওয়া তাঁদের ঋতের নিমিত্তে! ঋতপরায়ণ ঋতুদেবতাগণ রীত পালন করেন, ধৃতব্রত সকলে মঙ্গল বহন করেন, কৃতকর্মা সকলে নিয়ত বিচরণ করেন মঙ্গলের পথে।

বৈশাখের রুদ্র দেবতা, অগ্নিময় রূপ তাঁর! তাঁর সামনে দাঁড়ায় ধরিত্রী আকাশ একেবারে রিক্ত অঞ্জলি পেতে, পিপাসা জানায় তৃষাতুর কাতর প্রাণ! দিক্‌বধূ সকলে—রুদ্রদেবতার উপাসিকা তাঁরা—তপস্যা করেন বর্ষণমঙ্গল কামনা করে। রুদ্রের বর আসে রৌদ্র-দীপ্ত আকাশ ছেয়ে ঝড় দিয়ে।

প্লাবন আসে বর্ষণের দেবতার,—নব-নীরদ শ্যামশোভার প্লাবন, ভাঙে বানে, ভাসায় বন্যায়, বিদ্যুৎ হানে, বজ্র হানে, সকল অপূর্ণতার উপরে নামে বর পরিপূর্ণ ধারায়,—জেগে ওঠে দিকে দিকে প্রাণ সবুজ উচ্ছ্বাসে।

ভদ্রা যিনি—ভরা নদী বেয়ে আসেন তিনি! দুই কূলে উপ্‌ছে পড়ে তাঁর আশীর্বাদী মালা—তরঙ্গরেখার ছলে গাঁথা ফুটন্ত আশীর্বাদ।

শরৎলক্ষ্মী আলোর আশীর্বাদ ভরে আনেন নীল আঁচলে—অন্নপূর্ণা তিনি! সোনার ধানে ভরা সোনার তরী চলে দিকে দিকে তাঁর আশীর্বাদের ভার বয়ে মন্থরগতি—যেন তারা নীল আকাশের বলাকা!

পরিপূর্ণতার ভারে কাঁপে হেমন্তের করপুট, শীতল তাঁর চাহনি! তিনি বলেন, নিয়ে যাও আশীর্বাদ—শিশিরে-ধোয়া নির্মাল্য।

শীত দেবতার শুভ্র শান্ত রূপ! ক্লান্তিহর তিনি—জরা ঝরে যায় তাঁর স্পর্শে! অমৃত-শীতল নির্মল আশীর্বাদ তাঁর শিউলি ফুলের মতো ঝরে হিমের রাতে চুপে চুপে!

অনন্ত আনন্দ অনন্ত শোভা অনন্ত ঐশ্বর্য—বসন্ত-দেবতার!

যৌবনশ্রী তাঁকে বরণ করে ঋতুমালা হাতে—বিশ্বের যৌবনশ্রী

—পিককণ্ঠী—বীণাবাদিনী বিচিত্ররূপা বসন্তশ্রী তাঁর আশীর্বাদ—সকল বরের শেষ, সকল সুরের শেষ, সকল পরিপূর্ণতার শেষ এক ফোঁটা মধু।

সাথী

তেপান্তর মাঠ—চারদিকে ধূ-ধূ করছে, তার মাঝে একটি তাল গাছ, সে একলা বাড়ল। দূরে দূরে মাঠ-ঘেরা বন, সেখানে লতাপাতা সব গলাগলি করে আছে দেখা যায়—ঘন নীল ছায়ার মতো। মাঠের চেয়ে বড়ো আকাশ—সেখানে তারা সব ঘেঁষাঘেঁষি ঝিল্‌মিল্‌ করছে দেখা যায়—কেউ একা নেই। হাওয়া আসে, তার সঙ্গে আসে তার সাথী ফুলের গন্ধ। ঝড় আসে, তার সঙ্গে তার সাথী আসে আঁধি আর বৃষ্টি। মেঘ আসে, তার সঙ্গে আসে বিদ্যুল্লতা অপরূপ সুন্দরী! —সাথী ছাড়া কেউ নেই। শরতের মেঘ—তাদের সাথী হয়ে চলে বলাকা—পারিজাতের হারের মতো সার বেঁধে যায় দলে সাথী আর সেথো তারা!

তালগাছ কেবলি তাদের ডাকে—পাতাগুলো নেড়ে নেড়ে; কিন্তু তাকে একলা রেখে যে যার দৌড়ে পালায় খেলতে ছোটে। তেপান্তর মাঠে একলা গাছ নিশ্বাস ফেলে—বৃথা আঁকু-পাকু করে—তাদের সঙ্গে চলতে চায়—পারে না।

একদিন কোথা থেকে দুটি বাবুই পাখি সেই তালগাছের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। পাতার উপর বসে তারা দুটিতে মিছিমিছি কত কি বকাবকি করে। তারপর একদিন মাঠের থেকে কুটোকাটা নিয়ে তালগাছের প্রাণ যেখানে বাতাসে ঝিল্‌মিল্‌ করে সেইখানে চমৎকার করে তাদের সুন্দর বাসাটি বেঁধে নেয়।

তালগাছ তাদের দোলা দেয় আর মনে মনে বলে—মিলল, সাথী মিলল!

তার পর একদিন খেলাঘর ছেড়ে ছোটো ছোটো পাখি তারা একে একে উড়ে যায়। সবুজ পাতার গাঁথা শূন্য বাসা নিয়ে তালগাছ দোলা দেয় আর চুপ করে কি যেন ভাবে থেকে থেকে।

আসে না, জল আসে না—মাটির অন্তরে দুঃখ লাগে! বয় না, নদী বয় না—উদাস মাঠ শূন্যমন আকাশে চায়!

শুক্‌নো বালুচরে লুপ্ত ধারার শেষ চিহ্ন, বাতাস সেখানে ঘোরে ফেরে—হুতাশী বাতাস!

আকাশ যেন সে পিয়াসী চাতক—ক্ষণে ক্ষণে বলে—জল!

সুদূরে সমুদ্র ডাকে—নদী নদী! হারানো ঝরনার পাতরে পাতরে পেঁাছোয় সাগরজলের খেদ, পর্বত প্রতিধ্বনি দেয়—নদী নদী!

যেন আচম্‌কা ঝড়ে বর্ষণের খবর আসে!—অরণ্যে লতা-পাতা দুলে দুলে ওঠে, বেণুকুঞ্জে কা'রা যেন আপন মনে গুণগুণিয়ে আলো-ছায়ার আল্‌পনা টেনে চলে ক্ষণিকের ভুলে, আবার হঠাৎ থামে একটুখানি নিঃশ্বাস ফেলে!

এই ভাবে দিন যায়, কাটে রাত—হাওয়ায় নতুন পরশ লাগে, আলো হয়ে আসে কাজলা-পাখির বুকের পালকের মত কোমল! এল না, এল না, এই সুর তখন আর এক ছন্দে আলোকবীণার এলানো টানে মীড় দিয়ে বলে—এল না কি?

উদ্‌গ্রীব হরিণ ডাগর চোখে চায়, মরু-পারে সজল মেঘের মরীচিকা দেখে ভোলে সে উন্মনা! না-দেখা মেঘের ডাক শোনে—সহসা চমক্ লাগে ময়ূরের, অকারণে সে পাখনা মেলিয়ে দেয় সূর্যকিরণে—ইন্দ্রধনুর রঙীন মায়া ধ'রে দীপ্তি পায় চকিত ময়ূরের হঠাৎ উল্লাস!

দিকে দিকে বাদল ঘনিয়ে আসে, ভিজে মাটির সৌরভ বয়, বাতাস ভরে জল দোলে, জল দিকে দিকে, বৃষ্টি ঝরে দিনে রাতে, ধারাগৃহে মৃদঙ্গ বাজে, মন্দিরা বাজে, বেণু বাজে, বীণা বাজে অশ্রুভরা বেদন জানায় কথা আর সুর—বাদলবেলায় ফুটে-উঠা নীল দুটি রজনীগন্ধা তারা—যেন মনে পড়াতে আসে অবেলাতে শরতের আগমনী! শেষ বর্ষণে তখন কথা ভেসে যায়, সুর ভেসে যায়, বাদল শেষের উতল পাখি নীল আকাশে উড়ে উড়ে চলে সাদা মেঘের বাসার খোঁজে, ঘুরে

ফিরে অনাহত সুর বাজে কবির বীণায়—"এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার মুখর কবিরে..." মৌন রাত্রির বুকে বাজে নূতন পথিকের পদধ্বনি।

আনার-কলি

চৈতের হাওয়া কেবলি শুধিয়ে চলেছে ডালিম ফুলকে—বলি তোর আপন কই সে! খবর পাচ্ছে না হাওয়া—পাচ্ছে না সন্ধান!

ফুলবাগানে বুলবুল্ বৃথাই গুল্তন্ করে—ডালিম ফুলের আপনার যে তাকে দেখে না কোথাও!

ফুলের পাশে আছে নব-মঞ্জরী তাকে শোধায় রোদ—ডালিম ফুলের গোপন কথা—তরুণ সে আলো ভাবে বুঝি ডালিম ফুল হল তারি রঙে রঙ্গী!

আছে গাছের ছায়ায় ছায়া মিলিয়ে ডালিম ফুলের আপনার সে! আছে সে রোদের পাশেই, রাতের নীলে একেবারে লুকিয়ে!

ভাঙা বাগানে আনারগাছ শিউরে ওঠে রহে রহে, বলে—চৈত-বাতাস এই বুঝি ছেঁড়ে বোঁটার বাঁধন ফুল আমার—ফল আমার—পাতা আমার।

আলোকশিখা

বেলাশেষের পড়ন্ত আলো—নদীপারের অপার আলো; আকাশ তারি রঙের ভারে টলমল, জল তারি রঙে ছল্‌ছল্‌, বেণুবন তারি রঙে হিল্‌মিলি, বাতাস সেই রঙে ঝিল্‌মিলি।

বাদল মেঘ তাকে এসে ঢাকে; মন ফেরে তখন বাড়ি;—কুস্‌মি রঙে রাঙানো মন!

হাটের মাঝে লাগে মেলা—জ্বলে রঙ্‌মশাল—সবুজ, সোনালি, লাল নীল!

মন শোনে—তারা কেউ বলে, আমি রাতকে দিন করি; কেউ বলে পুরোনো পৃথিবীকে নতুন, সবুজে-সবুজে, নব-যৌবনে তাজা করে তুলি!

তুবড়ি, ফুলে-ফুলে-ফুলন্ত সন্ধ্যাযূথির দিকে আগুনের কুল-কুচি দিয়ে কি যে বলে, মন তা মনে-মনে বুঝে হাসতে-হাসতে ঘরে আসে।

ঘরের কোণে ছোট্ট দেল্‌কোয় মাটির পিদুম, মন তার দিকে চেয়ে ভাবে ঘরের লোকের কথা; ভাবে যুগযুগান্তরের মানুষ কে সে এই আলোটুকুকে ঘরের মধ্যে বরণ করে এনে চিরকালের জন্যে ঘর আলো-করার কাজে রেখে চলে গেল।

পিদুম্

জানে না যেন—কে দিয়েছে তাদের আলোর সমান করে ফুটিয়ে, অন্ধকার রাতে এমনি ভাবে চেয়ে আছে আমার দিকে লক্ষকোটি তারার প্রদীপ!

বোঝে না যেন—কোথা থেকে পায় সে নিত্য-নূতন আলো যার অরুণিমাতে রাঙিয়ে ওঠে বিশ্বভুবন, রাতের পর্দা সরিয়ে এইভাবে চেয়ে থাকে শুকতারার দিকে সকালের সূর্য, আর এই আমার মুখে চায় বিস্ময়ে ?

কে তাকে অপরূপ আলোর রক্তজবার মালা দিয়ে বরণ করে নেয় রাতের বাসরেতে, এই বলে যেন চায় সন্ধ্যাতারার দিকে অস্তমান দিন, আর চায় সে আমার দিকে!

আলোর বিস্ময় ঝিলিক্ দেয় বাদল রাতের বিদ্যুন্মালাতে, চন্দ্রোদয়ে সাগরজলে, মেঘ ফাটা রোদে, আলোর কুহেলিকা ঘেরা শীতের সকালে!

ঘরের প্রদীপ যে জানে শুধু রহস্য—থেকে থেকে বাতাসের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে বলে যায় সে—মাটির পিদুম্, আমি দেখে নিয়েছি তাকে, যে নিত্য নিত্য আমাতে ধরে আমার আলো, তোমার আলো, তারও আলো!

নতুন খাতা

পুরোনো ডালের আগায় আল্‌গা বাঁধনে বাঁধা শুক্‌নো পাতা কাল-বৈশাখী হাওয়া পেয়ে উড়ল—সহজে, আনন্দে—সাঁতার দিয়ে চলে গেল সে তেপান্তর মাঠের ওধারে—যেখানে বিজলি-হানা মেঘ দিক অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছে!

নতুন খাতায় শক্ত করে বাঁধা পাতা—হাওয়াতে কেবলি সে ওলোট্‌ পালট্‌ করলে উড়তে;—বৈশাখী ঝড় চলে গেল খেলতে এসে দক্ষিণ উত্তর পূর্ব পশ্চিম ঘুরে ঘুরে!

অশথ পাতা

পুরোনো বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের একটা কোণ—সেখানে গজালো ছোট্ট একটি অশথ গাছের দুটি পাতা ফাটা ইঁটের পাঁজর জড়িয়ে ধসে-যাওয়া কানাচে এসে যেন বাঁধলো বাসা একটুকু সবুজ টুনটুনির জুড়ি আষাঢ়ের আরম্ভে।

সেই ভাঙা বাড়ির কানাচ, সেখানে ব'সে এতটুকু মেয়ে খেলে—পরনে তারও সবুজ ঝাব্‌লা; তার সঙ্গে একটি বুড়ি সাদা কাপড় পরা—যেন সে জল-ঝরা শরতের মেঘ, সে থেকে থেকে ছড়া কাটে—“অশথপাতা কুঞ্জলতা শ্যাম পণ্ডিতের ঝি।” অশথ পাতা দোলে মেয়েটা খেলে।

আমি আমার ঘরে ব'সে এই ছবিটা দেখি আর গজদন্ত ও রেশম গলানো চমৎকার কাগজে তুলে চলি দিনের পর দিন এই ছবি।

ছবি শেষ হয়ে যায়। ভোর রাতের ঘুমের মাঝে হঠাৎ মাটি কাঁপতে থাকে, আকাশে বয় ঝড়, চেঁচিয়ে ওঠে ঘুমন্ত পাখি, ধসে পড়ে পাশের পুরোনো বাড়িটা, আনাচ কানাচ সমস্ত নিয়ে। শুধুই ছবিটা প'ড়ে থাকে আমার কাছে—এতটুকু কাগজে লেখা আষাঢ়ের অনেকগুলো দিনের একটি ছবি।

চৈতের মুহূর্ত

ফাল্গুনের ফুলের খেলা শেষ হ'য়ে আসছে, তখন একদিন দুপুরে উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরে একলা আছি তক্তাপোশের উপর তলায় আমি, নীচের তলায় নূতন সঙ্গী এ বাড়ির পোষা কুকুরটা। সবার আলিস্‌-ভাঙার বেলা সেটা কাজের সুরের মাঝে একটুখানি থম্‌—চুপ হ'য়ে আছে বাড়ি বাগান অঙ্গন মাঠ আকাশ বাতাস সমস্তই, ঘুমিয়ে আছি না জেগে আছি, এই ভাব! বড়ো বড়ো কাচবন্ধ জানালার ওধারে মস্ত বড়ো নাচঘরটা। যেন প্রতীক্ষা করছে কারো, চাচ্ছে যেন চৈতালির সুরে তালে অকস্মাৎ মুখর হ'য়ে ওঠে, নিঃস্বপ্ন রোদ অনড় শুয়ে বাইরে যাবার দুয়োরগোড়ায় শয়ন বিছিয়ে, আর কেউ নেই কাছাকাছি। ঘড়ি জানালো কখন উৎরে গেল ফাল্গুনের দিন, ঘুমন্ত মানুষ ঘুমের আলিসে আছি তো আছি। দাপ্‌টে এল চৈতালি, খর-ঝন্‌ঝনা তুললে নাচঘরের স্ফটিক বাতায়নগুলো একটার পর একটা, চমকভাঙা মন বললে চৈতালির কবিকে এল খুঁজে চৈতের উতলা বাতাস, ঘুমভাঙা-চোখ দেখলে হারিয়ে গেছে কবি, বন্ধ জানালার বাইরে আছাড় পিছাড় করছে কবির ফুলবাগানের তরুলতা, কাচের বাধা ভেঙে তারা যেন আসতে চাইছে খুঁজতে চৈতালির কবিকে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা-আকাশ চেয়ে আছে স্নিগ্ধ করুণ দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে, হারিয়ে-যাওয়া মানুষের না-গাওয়া সুর শূন্য ঘরের শূন্যতা পরিপূর্ণ ক'রে শুনি বলছে—

> "রোদনভরা এ বসন্ত, সখি,
> কখনো আসেনি বুঝি আগে
> রোদন-ভরা এ বসন্ত......"

হাওয়া-বদল: শব্দচিত্র নামে অবনীন্দ্রনাথের এই টুক্‌রো রচনাগুলি আনুমানিক ১৯২৪ সালে কার্সিয়াং যাবার পথে ও কতক কার্সিয়াঙে বসে লেখা। মুসৌরী পাহাড়ে তাঁর অবকাশ যাপনের কতকগুলি অনুরূপ চিত্র অবনীন্দ্রনাথ ধরে রেখেছেন পথে বিপথে (বিশ্বভারতী ১৩৫৩) গ্রন্থের গিরিশিখরে শীর্ষক অধ্যায়ে।

হাওয়া-বদল: শব্দচিত্র রচনাগুলি সম্বন্ধে বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী গ্রন্থের অন্তর্গত 'অরূপ না রূপ' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন..."পর্বতে বসে রূপ-অরূপ দুয়েরই হিসেব দিয়ে ছবি দেখে আমি অনেকগুলো নোট খাতায় টুকে এনেছি... 'সকালে ফোটা সূর্যমুখী ফুলটিকে নীল আকাশের আলোর খবর এনে দিতে না দিতেই প্রথম পৌষের দুরন্ত কুয়াসা দিক বিদিক ঘিরে নিলে।'

কিংবা যেমন—'পাহাড় তলিয়ে যাচ্ছে হিমের প্লাবনে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সকালের আলো—কূল-হারানো একলা হাঁস।'

অথবা যেমন—'সন্ধ্যার আকাশ চেয়ে দেখছে দিনের শেষে আলোর জয়পতাকা শীতের কুয়াসা নামিয়ে রাখছে ফুলের বনের পায়ের কাছটিতে।'

তিনটি ছোট-ছোট স্থান, চিত্রও নয় কবিতাও নয় গল্পও নয়। হাতের লেখায় ধরা দিলে ছবি কটা সহজে, কিন্তু তুলির আগায় এদের আটকাতে গেলে দেখবো—দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুটিই ছবি হয়ে রূপ পেয়ে বসে আছে কিন্তু প্রথমটির বেলায় মুস্কিল, সেখানে রূপ সাদা কাগজ থেকে পিছলে পড়তে চায়, ঘন কুয়াসা পটের সবটা অধিকার করতে চায়।..."

এই পর্যায়ের রচনাগুলির কয়েকটি বাদে অধিকাংশই পূর্বে প্রকাশিত। নীচে রচনাগুলির পত্রিকায় প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্য সংকলিত হল। যে-সমস্ত রচনা শিরোনামহীন, সেগুলির প্রথম ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে কতকগুলি লেখার একাধিক খসড়া পাওয়া গিয়েছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা দেখানো হল।

আমার সকালেও ঘুম ভাঙে না	বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৫৩
শিয়ালদহ	মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪
E.B.S.R.	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৫৫
সহরতলি	মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪
	'নারকেলডাঙ্গা' ও 'বেলেঘাটা' নামে ঈষৎ ভিন্ন পাঠে দুটি রচনা ১৩৫৫ সালের আনন্দ-মেলা পূজাবার্ষিকীতে প্রকাশিত।

পদ্মা	মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪ 'সারাঘাট' নামে ভিন্ন পাঠে আনন্দমেলার পূর্বউল্লিখিত সংখ্যায় প্রকাশিত।
জলপাইগুড়ি	মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪ আনন্দমেলার পূর্বউল্লিখিত সংখ্যায় 'পার্বতী-পুর' পাঠান্তরে প্রকাশিত।
শিলিগুড়ি	মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫, পাঠান্ত-রিত দুটি রচনা 'জলপাইগুড়ি' 'শিলিগুড়ি'। পাণ্ডুলিপিতে আর একটি পাঠ নিম্নরূপঃ "সবুজ নিশেনের ইশারা পেয়ে বাচ্ছা ইঞ্জিন মানুষ-বোঝাই ছোট ছোট গাড়ি টেনে হিমালয় টপ্‌কাতে বার হয়ে চলেছে। উনুনের উপরে ধরা চায়ের একটা কেট্‌লি গলা বাড়িয়ে তার কাণ্ড দেখ্‌ছে।"
সুক্‌না	মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫, ভিন্নতর পাঠ দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুলিপিতে অপর একটি পাঠঃ "ছোট্ট ইঞ্জিন ছোট্ট ছোট্ট গাড়ি টেনে চলতে চলতে থেকে থেকে সিটি দিয়ে টিনের স্টেশনকে ডাকতে ডাকতে পাহাড় কত বড় দেখতে ছুটলো। পাহাড় মেঘের আড়ালে লুকিয়ে বললে 'আমি তো নেই।' "
সুক্‌নার জঙ্গল	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫
বনপথ	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫
তিস্তা	মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪
পাহাড়তলি	মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫, পাঠান্তর দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুলিপিতে অপর একটি পাঠঃ "সকালের কুয়াসা হিমের ভারে মন্থর—মাঠ ছেড়ে সে যেতেই চায় না। শিশিরভেজা সবুজ-মাঠে শরৎকালের জলের ধারা মন্থর—চলতেই চায় না, কলের গাড়ি চলেছে তো চলেইছে—থামতেই চায় না।"

পর্বত	মানসী ও মর্ম্মবাণী, বৈশাখ ১৩৩৪ পাঠান্তরঃ "মন বলে দিন দুপুর, বন বলে নিশুৎ রাত! বনের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ বলে শরৎকাল, গাছের পাতায় পাতায় ঝিঁ ঝিঁ ডাকে বর্ষা যায় নি।"
তলপাহাড়ের বনের ধারে	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫
দেখা বন সারি সারি গাছ	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫
পেটা লোহার সরু একখানা মই	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫
কাছে স্টেশনঘর, কোথাও কিছু নেই	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫
সুন্‌সান্ বনের তলা	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫
ইস্পাতে কাটা একটা 'দ'	অপ্রকাশিত
বনের মধ্যে সরু দুটো তারের ফাঁসি	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫
কিছুই দেখা যায় না	আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫
অপরিচয় ঢেউ দিয়ে উঠেছে	অপ্রকাশিত
পাহাড়ের নীল চন্দন	অপ্রকাশিত
নিথর নীল জল	অপ্রকাশিত
ভাদরের ভরা নদী সেই	অপ্রকাশিত
প্রথম যুগের ফুলের দোল	অপ্রকাশিত
আলো করা শরতের মেঘ	অপ্রকাশিত
উত্তর পর্বতের মেঘ	উত্তরা, পৌষ ১৩৩২ আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৪৫ পাঠান্তর দ্রষ্টব্য
উত্তরে তুষার পর্বতের নিশ্চল তরঙ্গ	উত্তরা, পৌষ ১৩৩২
ঊষার আলো শীতকাতর পাখির মতো	উত্তরা, পৌষ ১৩৩২

রেশ ঝরনা ইত্যাদি বাকি ঊনচল্লিশটি রচনা বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-চৈত্র ১৩৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত।

পাহাড়িয়াঃ গদ্যছন্দ পর্যায়ের রচনাগুলি অধিকাংশ বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, বেণু ও উত্তরা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দুটি। রচনাস্থল কার্সিয়ং। রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথের এই লেখাগুলির প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয়নি।"

অবনীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলির সঙ্গে হাওয়া-বদলঃ শব্দচিত্র পর্যায়ের টুকরো

রচনাগুলির অনেক ক্ষেত্রে মিল লক্ষণীয়; বস্তুত গদ্যছন্দে রচিত এই দীর্ঘ রচনাগুলির প্রস্তুতিরূপে শব্দচিত্রগুলিকে দেখাই সংগত।

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত এই রচনাগুলির সূচী দেওয়া হলঃ

পাহাড়িয়াঃ গদ্যছন্দ	বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৪
পাহাড়িয়া রংমহলঃ গদ্যছন্দ	বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩৪
পাহাড়িয়াঃ তিনদরিয়া	বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৩৪
পাহাড়িয়াঃ মেঘমণ্ডল	বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৪
হাটবার। সাহাজাদপুর	বেণু, আশ্বিন ১৩৩৪
আতসবাজিঃ গদ্যছন্দ	উত্তরা, কার্তিক ১৩৩৪
এ কার জন্য?	ঋতুপত্র, বৈশাখ ১৩৬২। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের Visitor's Book-এ অবনীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে রক্ষিত।

অন্যান্য রচনা—এই বিভাগে সংকলিত রচনাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও সংকলন-গ্রন্থ হতে গৃহীত।

রচনাগুলির প্রকাশকাল ও অন্যান্য তথ্য পরিবেশিত হলঃ

ছবি ও সুর	রচনাস্থল রাঁচী। ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত
সবুজ বিপদ	বুধবার, ৬ অগ্রহায়ণ ১৩২৯
দীপালি	শরতের ফুল, ভাদ্র ১৩৩২ —নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত।
ঘুমতী নদী	উত্তরা পত্রিকার সহ-সম্পাদককে লিখিত পত্র। পত্রের প্রথমাংশ বর্জিত; বর্জিত অংশ নিম্নরূপঃ

কলিকাতা ১১ই মাঘ

শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী—সহ-সম্পাদক 'উত্তরা'

প্রিয়বরেষু—

তোমাকে বলেছিলেম যা বলবার ইচ্ছা ছিল তা বাড়ি গিয়ে লিখে পাঠাবো—কিন্তু তখন ভাবি নি সেখানকার আব-হাওয়াতে যে-সব কথা ফুটি ফুটি করলেও তারা এখানে এসে ঝরে যাবে। আবার যদি দিন পাই তো সে-সব কথা যত্নে ফুটিয়ে

মালা গেঁথে পাঠাবো 'উত্তরার' জন্যে। গোমতী নদীকে আমাদের আগেকার লেখকেরা ভালো চক্ষে দেখেন নি, তা তো জানো—"ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং গোমতীতীরে" কিন্তু সত্যি বলছি—ঐ গোমতীর ধারেই আমি অনেক দিন প'রে একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়ে এসেছি—আমি বোধ কচ্ছিলেম আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে কিন্তু এই নদীপারে আমার নতুন কর্মক্ষেত্র আমি বিস্তৃত দেখে এলেম, কাজেই আমি সেই...

দোলনচাঁপা	আনন্দবাজার পত্রিকা, পঞ্চম বার্ষিক দোল-সংখ্যা ১৫ ফাল্গুন ১৩২২
ঋতুমঙ্গল	কালিকলম, কার্তিক ১৩৩৩
সাথী	বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৩৩। অবনীন্দ্র রচনা-বলী ২
আসা-যাওয়া	বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩। জোড়াসাঁকোয় বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে পঠিত।
আনার-কলি	রচনাকালঃ ১৪ই চৈত্র ১৩৩৩। ধূপছায়া, বৈশাখ ১৩৩৪, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। 'আপনকথা'র পাণ্ডুলিপিতে এই রচনার ঈষৎ পরিবর্তিত একটি পাঠ সূচনা-স্বরূপে পাওয়া যায়; প্রকাশ ভবন-প্রকাশিত অবনীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ডে সেটি মুদ্রিত।
আলোক শিখা	রংমশাল, শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৫
নতুন খাতা	চিত্রা, বৈশাখ ১৩৩৬
অশথ পাতা	বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৭
পিদুম	শান্তিনিকেতন, ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৮ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।
চৈত্রের মুহূর্ত	বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০। রবীন্দ্র-নাথের উদ্দেশে রচিত।

তিনটি পর্যায়ের রচনার সূচনায় তিনটি চিত্র মুদ্রিত হল। প্রথম চিত্রের শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্র ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত। গ্রন্থের অন্যান্য চিত্রও ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত।

শ্রীশঙ্খ ঘোষ এই সংকলন সম্পাদনায় বিবিধ পরামর্শ দান করেছেন; শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীপার্থ বসু ও শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক নানাভাবে সহায়তা করেছেন; কয়েকটি

দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীমতী আরতি সেন ও শ্রীজীবেন্দ্রকুমার সিংহ রায়। গ্রন্থ মধ্যে ব্যবহৃত অবনীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র শ্রীসৌম্যেন অধিকারীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। এঁদের সকলের কাছে সংকলয়িতাদ্বয় আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

